নির্মিতি

রচনা

আমাদের জাতীয় পতাকা

ভূমিকা : জাতীয় পতাকা একটি স্বাধীন জাতির সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তাই প্রতিটি স্বাধীন দেশ ও জাতিরই একটি জাতীয় পতাকা আছে। জাতীয় পতাকা দেশের সব মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। যেকোনো স্বাধীন দেশ বা জাতি তার জাতীয় পতাকাকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে।

জাতীয় পতাকার আকার ও আকৃতি : বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬। পতাকার দৈর্ঘ্য যদি ৩০৫ সেন্টিমিটার (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেন্টিমিটার (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ হবে পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। আমাদের জাতীয় পতাকার ডিজাইন করেছেন শিল্পী কামরুল হাসান।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রতীক : বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এদেশে সকল ধর্মের মানুষের বসবাস রয়েছে। কিন্তু ধর্ম আলাদা হলেও সবার ভেতরে রয়েছে একই জাতিসত্তা। আর তা হলো বাঙালি জাতিসত্তা। বহু ত্যাগের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। লাল-সবুজের পতাকা আমাদের সে স্মৃতিকেই বহন করছে। এ পতাকা আমাদের সংগ্রামের ইতিহাসকে তুলে ধরে সব প্রজন্মের সামনে।

জাতীয় পতাকার বিশেষত্ব : আমাদের জাতীয় পতাকার সবুজ রং বাংলাদেশের শ্যামল প্রকৃতির দিকটিকে তুলে ধরেছে । লাল রং তুলে ধরেছে নবজাগরণের কথা। এছাড়া স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এ দেশের মানুষ যে রক্ত দিয়েছে তার ইঙ্গিতও বহন করে লাল রং। মোটকথা, আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে জাতীয় পতাকা।

জাতীয় পতাকার গুরুত্ব : জাতীয় পতাকা আমাদের সকল বৈষম্য দূর করে দেয়। আমরা এ পতাকার ছায়াতলে একত্রে মিলিত হই। আমরা পরস্পরের মধ্যে সকল ভেদাভেদ ভুলে যাই। এছাড়া আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার প্রেরণাও আমরা জাতীয় পতাকা থেকে পাই। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অগ্রগতির সঙ্গে জাতীয় পতাকা গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। হিমালয়ের চূড়া থেকে শুরু করে আমাদের যে কোনো অর্জনেই জাতীয় পতাকা সবার আগে আমাদের হাতে উঠে আসে। আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের স্মারক জাতীয় পতাকা। শুধু বর্তমানের নয়, ভবিষ্যতের সকল কর্মপ্রেরণার উৎসও আমাদের জাতীয় পতাকা।

জাতীয় পতাকার সম্মান : জাতীয় পতাকার জন্য আমরা গর্ববোধ করি। তাই একে সম্মান করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব। বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। এছাড়া অন্যান্য স্থানে বা অনুষ্ঠানে যখনই জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করা হোক না কেন, তখনই দাঁড়িয়ে তার প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। যে জাতীয় পতাকাকে সম্মান করে না, সে সকলের ঘৃণার পাত্র। তাকে সকলে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে।

উপসংহার : জাতীয় পতাকা আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত মর্যাদার ও সম্মানের। বুকের রক্ত দিয়ে হলেও এর সম্মান রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের লক্ষ লক্ষ বীর শহিদ এ পতাকার জন্যই তাঁদের জীবনদান করেছেন। যখন নীল আকাশের মাঝে আমাদের এ পতাকা উড়তে থাকে, তখন তা দেখে গর্বে আমাদের বুক ভরে যায়।

আমাদের গ্রাম

ভূমিকা : সবুজে শ্যামলে ভরা আমাদের এদেশের বেশির ভাগ স্থানজুড়ে রয়েছে গ্রাম। আমাদের এ গ্রামগুলো যেন সবুজের লীলাভূমি। গ্রামের সবুজ প্রকৃতি যেকোনো মানুষের হৃদয়কে প্রশান্তিতে ভরে দেয়। গ্রামের শান্ত পরিবেশ মানুষের সকল ক্লান্তি দূর করে। গ্রামই এদেশের প্রাণ।

গ্রামের অবস্থান : আমাদের গ্রামের নাম রতনপুর। এটি ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার অন্তর্গত। এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ইছামতী নদী। নদীর দুপাশের প্রাকৃতিক শোভা এ গ্রামকে অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছে। ঢাকা থেকে সড়ক পথে খুব সহজেই আমাদের গ্রামে আসা যায়।

গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য : আমাদের গ্রামখানি ছবির মতো। আম-জাম, কাঁঠাল-লিচু, নারিকেল-সুপারি, শিমুল-পলাশ, তাল-তমাল আর নানাজাতের গাছপালায় সুসজ্জিত আমাদের এই গ্রাম। ঝোপঝাড় লতাপাতার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা সবার মন কেড়ে নেয়। পাখপাখালির কলকূজনে সব সময়ই মুখর থাকে গ্রামখানি। দিগন্তবিস্তৃত ফসলের মাঠ, ধান-কাউনের হাতছানি, নিঝুম দুপুরে বটের ছায়ায় রাখালের বাঁশি উদাস করে মনপ্রাণ। দিঘী-ডোবা, বিল-ঝিল– কী এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সঞ্চয়!

গ্রামের মানুষ : আমাদের গ্রামে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ বাস করে। তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কোনো ভেদাভেদ নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই সব মানুষ এখানে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে।

গ্রামের মানুষের জীবিকা : আমাদের গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া কিছু জেলে এবং তাঁতিও এখানে রয়েছে। কিছু মানুষ লেখাপড়া শিখে শহরে চাকরি করে। তবে সে সংখ্যা নিতান্তই কম। এছাড়া কিছু মানুষ দিনমুজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

গ্রামের অর্থনৈতিক উৎস : বাংলাদেশের বেশিরভাগ গ্রামের মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল। তবে আমাদের গ্রামের চিত্র একটু ভিন্ন। গ্রামের বেশিরভাগ পরিবারেরই একজন করে দেশের বাইরে থাকে। তাদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা এ গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থাকে মজবুত করেছে। গ্রামের আয়ের আরেকটি বড় উৎস কুটির শিল্প। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই নকশীকাঁথা, উলের তৈরি গালিচা, পাটের তৈরি নানা গৃহসজ্জার পণ্য তৈরি হয়। এগুলো শহরে বিক্রি করে গ্রামের মানুষ প্রচুর অর্থ আয় করে। এছাড়া কৃষিজাত পণ্য যেমন : ধান, পাট, গম ও নানা ধরনের সবজি তরকারি বিক্রি করেও গ্রামের মানুষ অর্থ রোজগার করে। প্রতি বুধবার গ্রামে হাট বসে। হাটে শহরের লোকজন এসে সরাসরি গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিজাত পণ্য সংগ্রহ করে।

গ্রামের প্রতিষ্ঠান : আমাদের গ্রামে একটি প্রাথমিক ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ ছাড়া একটি কামিল মাদ্রাসা রয়েছে। আরো রয়েছে একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও দুটি বেসরকারি অফিস। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি মসজিদ, একটি মন্দির ও একটি গির্জা রয়েছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে রয়েছে একটি পোস্ট অফিস।

গ্রামের সংস্কৃতি : সাংস্কৃতিকভাবে আমাদের গ্রাম খুবই উন্নত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এখানে নানা ধরনের মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। যেমন : চৈত্র মাসের শেষে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা, বৈশাখ মাসে বৈশাখি মেলা, অগ্রাণ মাসে নবান্ন অনুষ্ঠান, পৌষ মাসে পিঠার অনুষ্ঠান ইত্যাদি। গ্রামের মুসলিম ও হিন্দু বিয়েতে লোকজ গান, নাচ ও খাবারের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দিবসে স্কুলে অনুষ্ঠানের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবেও লোকজন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রামের অবদান : মহান মুক্তিযুদ্ধে এ গ্রামের মানুষের অবদান অনেক। এ গ্রামের মানুষের সাহসিকতা ও বীরত্বে পাকিস্তানি বাহিনী এ গ্রামে প্রবেশের খুব একটা সুযোগ পায়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ অঞ্চলের দুজন আঞ্চলিক কমান্ডার এ গ্রামে থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। পাকিস্তানি বাহিনীর গতি রোধ করার লক্ষ্যে এ গ্রামের এক ছেলে ব্রিজ ধ্বংস কতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। তাঁর এবং মুক্তিযুদ্ধে আরো যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের স্মরণে গ্রামে একটি শহিদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে।

উপসংহার : আমাদের রতনপুর গ্রাম আমাদের কাছে খুব প্রিয়। এ গ্রামের প্রকৃতি মায়ায় জড়ানো। রতনপুরের মানুষ সহজ-সরল ও অতিথিপরায়ণ। ইছামতী নদীর সৌন্দর্য এ গ্রামকে করেছে অন্য সব গ্রাম থেকে আলাদা। রতনপুর গ্রামের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে।

দর্শনীয় স্থান

ভূমিকা : ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ আমাদের বাংলাদেশ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসক এ দেশকে শাসন করেছেন। তাঁরা তৈরি করেছেন বিভিন্ন সুরম্য প্রাসাদ, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি। এগুলো এখন আমাদের দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া আমাদের দেশ প্রাকৃতিকভাবেও মনোরম। এ দেশের বন, পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গলও আমাদের দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থান : বাংলাদেশের ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : দিনাজপুরের কান্তজী মন্দির, নওগাঁর পাহাড়পুর, বগুড়ার মহাস্থানগড়, নাটোরের দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি (উত্তরা গণভবন) ও রানি ভবানীর বাড়ি, পুঠিয়ার জমিদারবাড়ি, গাজীপুরের ভাওয়াল রাজবাড়ি, ঢাকার আহসান মঞ্জিল, নারায়ণগঞ্জের সোনার গাঁ, কুমিল্লার ময়নামতি ইত্যাদি। প্রাকৃতিক দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : দিনাজপুরের রামসাগর, নাটোরের চলনবিল, নেত্রকোনার বিড়িসিরি, সিলেটের জাফলং, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত ইত্যাদি।

দর্শনীয় স্থান হিসেবে নাটোর : রাজশাহী বিভাগের একটি জেলা শহর নাটোর। এর উত্তরে রয়েছে নওগাঁ ও বগুড়া জেলা, দক্ষিণে পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলা, পূর্বে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমে রাজশাহী জেলা

অবস্থিত। নাটোর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এখানে ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক উভয় ধরনের দর্শনীয় স্থান রয়েছে।

নাটোরের ঐতিহাসিক স্থান : ১৮৬৯ সালে নাটোর মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। পরবর্তীকালে নাটোর পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত হয়। প্রাচীন শহর হওয়ায় নাটোরে অনেক ঐতিহাসিক স্থাপনা লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি ও ছোটতরফ রাজবাড়ি উল্লেখযোগ্য। রানি ভবানীর কীর্তি নাটোরের মানুষ এখনো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

রানি ভবানীর কীর্তি : একজন দক্ষ জমিদার প্রজাদরদি হিসেবে রানি ভবানীর নাম সর্বজনবিদিত। তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজহিতৈষী ও উদার মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি শত শত মন্দির, অতিথিশালা ও রাস্তা নির্মাণ করেন। প্রজাদের পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য তিনি অনেকগুলো পুকুর খনন করেন। তিনি শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ছিলেন।

দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি : নাটোর শহর থেকে প্রায় ২.৪০ কিলোমিটার দূরে দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি অবস্থিত। রাজা দয়ারাম রায় এ রাজবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ১৮৯৭ সালে নাটোরে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। এতে দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে দেশি-বিদেশি স্থপতি ও শিল্পীদের দ্বারা রাজা প্রমদানাথ রায় রাজবাড়িটি পুনর্নির্মাণ করেন। এ রাজবাড়ি প্রায় ৪৩ একর জমির উপর নির্মিত। সমস্ত রাজবাড়িটি উঁচু দেয়াল দ্বারা আবৃত। রাজবাড়িতে ঢোকার মুখে একটি সিংহদ্বার রয়েছে। এ সিংহদ্বারের দুই প্রান্তে দুটি কামান রয়েছে এবং মাথার উপরে রয়েছে একটি সুদৃশ্য বড় ঘড়ি। মূল ভবনের ভেতরের সাজসজ্জা ও আসবাবপত্র এখনো মানুষকে বিস্মিত করে। ভবনের পেছন দিকে রয়েছে একটি বাগান। এখানে দুষ্প্রাপ্য অনেক গাছ আছে। সমস্ত রাজবাড়িটি একটি গভীর ঝিল দ্বারা পরিবেষ্টিত। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান দিঘাপতিয়া রাজবাড়িকে 'দিঘাপতিয়া গভর্নর হাউস' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিঘাপতিয়া রাজবাড়িকে 'উত্তরা গণভবন' নামে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

ছোটতরফ রাজবাড়ি : নাটোর জেলার বঙ্গজল নামক স্থানে ছোটতরফ রাজবাড়ি অবস্থিত। রাজা চন্দ্রনাথ রায়, যোগেন্দ্রনাথ রায়, জীতেন্দ্রনাথ রায় ও বীরেন্দ্রনাথ রায়ের তত্ত্বাবধানে রাজবাড়িটি পরিচালিত হতো। বর্তমানে এটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে রয়েছে। ছোট তরফের ভেতরে অনেকগুলো গভীর পুকুর রয়েছে। রাজবাড়ির সীমার মধ্যে মন্দির রয়েছে সাতটি। এ ছাড়া দুটি বড় ভবন এবং বেশ কয়েকটি ছোট ভবন রয়েছে।

চলনবিল : নাটোরের প্রাকৃতিক দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে চলনবিল একটি। বর্ষার সময় চলনবিল পানিতে ভরে যায়। তখন এর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অনেক পর্যটক এখানে বেড়াতে আসে। চলনবিলের উপর নৌকায় ঘুরে তারা এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে।

নাটোরের কাঁচাগোল্লা : ঐতিহাসিকভাবে নাটোরের কাঁচাগোল্লা মিষ্টি সুপ্রসিদ্ধ। দুধ দ্বারা কাঁচাগোল্লা প্রস্তুত করা হয়। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী এ মিষ্টির খ্যাতি রয়েছে।

উপসংহার : শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতো সুন্দর বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সৌন্দর্যের কোনো তুলনা নেই। ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক উভয় দিক থেকেই আমাদের দেশ সমৃদ্ধ। আমরা অনেকেই টাকা খরচ করে দেশের বাইরের সৌন্দর্য দেখতে যাই। কিন্তু আমাদের দেশ যে সৌন্দর্যের লীলাভূমি তা হয়তো অনেকেই জানি না। দেশকে ভালোভাবে চিনে-জেনে দেশের সৌন্দর্য উপভোগে আমাদের তৎপর হওয়া উচিত ।

বাংলাদেশের নদনদী

ভূমিকা : কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশে অসংখ্য নদীর সমাবেশ দেখে একে 'জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলা' বলে অভিহিত করেছেন। ছোট-বড় প্রায় সাত শ নদী এ দেশকে ঘিরে রয়েছে। নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এ দেশের অনেক জনপদ। মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে নদীগুলো এ দেশ ঘিরে রেখেছে। তাই এদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলা হয়।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদনদী : বাংলাদেশের সব নদীর একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা বেশ কঠিন কাজ। তবে এ দেশের প্রধান কিছু নদীর নাম আমাদের সবারই জানা। সেগুলো হলো : পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী ও মাতামুহুরী।

পদ্মা : বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মা। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে এর উৎপত্তি। ভারতে এ নদীর নাম গঙ্গা। মূলত গঙ্গা নদীর যে ধারাটি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, তার নামই পদ্মা। এ নদী রাজশাহী জেলার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের নিকট যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পদ্মার প্রধান শাখা নদীগুলো হচ্ছে : কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁ। মহানন্দা পদ্মার প্রধান উপনদী।

মেঘনা : মেঘনা নদীর জন্ম আসামের পাহাড়ে। সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর মিলিত স্রোত আজমিরিগঞ্জের কাছে এসে 'কালনী' নামে পরিচিতি পেয়েছে। শেষে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরববাজারের কাছে এসে এ নদী মেঘনা নাম ধারণ করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস ও চাঁদপুরের ডাকাতিয়া মেঘনার দুটি প্রধান শাখা নদী। গোমতী, মনু, বাউলাই মেঘনার উপনদী।

যমুনা : যমুনার উৎস হিমালয় পর্বতে। যমুনা নদী গোয়ালন্দের কাছে এসে পদ্মা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ধলেশ্বরী যমুনার প্রধান শাখা নদী। ধরলা, তিস্তা, করতোয়া ও আত্রাই যমুনার উপনদী।

কর্ণফুলী : কর্ণফুলী নদীর জন্ম আসামের লুসাই পাহাড়ে। রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এ নদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭৪ কিলোমিটার। কর্ণফুলী নদী অত্যন্ত খরস্রোতা। এ নদীর উপর বাঁধ দিয়েই নির্মিত হয়েছে কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এ নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে কর্ণফুলী কাগজ ও রেশম শিল্প-কারখানা। কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী হচ্ছে হালদা, বোয়ালখালী ও কাসালং।

ব্রহ্মপুত্র : হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবরে এ নদের উৎপত্তি। তিব্বতের পূর্ব দিক ও আসামের পশ্চিম দিক দিয়ে এ নদ প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বংশী ও শীতলক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা নদী। ধরলা ও তিস্তা এর উপনদী।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নদ-নদীর প্রভাব : নদীর সঙ্গে আমাদের জীবন গভীরভাবে জড়িত। আমাদের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে নদীপথ। নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এ দেশের অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র। আমাদের কৃষিক্ষেত্র অনেকাংশেই নদীর ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীরা নদীকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য সাহিত্যকর্ম ।

নদ-নদীর উপকারিতা : বাংলাদেশকে সবুজে-শ্যামলে ভরে তোলার পেছনে নদ-নদীর ভূমিকা অপরিসীম। নদীর পানিতে বয়ে আসা পলি প্রাকৃতিকভাবে আমাদের মাটিকে উর্বর করেছে। আমাদের কৃষির অগ্রগতিতে তাই নদীর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও নদীগুলো মিঠা পানির মাছের অন্যতম উৎস। নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে অসংখ্য মানুষ। দেশীয় প্রয়োজন মিটিয়েও মাছ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা হয়। এ ছাড়া পরিবহন-সংক্রান্ত কাজেও নদীকে ব্যবহার করা হয়। একশ্রেণির মানুষ এ কাজ করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

নদ-নদীর অপকারিতা : নদীর কিছু অপকারিতাও আমাদের চোখে পড়ে। বর্ষাকালে নদীগুলো ফুলে-ফেঁপে ওঠে। তখন বন্যা দেখা দেয়। এ ছাড়া নদীর প্রবল স্রোতে ভাঙন শুরু হয়। কখনো কখনো কোনো কোনো গ্রাম ভাঙতে ভাঙতে নদীর মাঝে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের ঘরবাড়ি, জমিজমা, গাছপালা, গবাদিপশু ও গৃহসামগ্রী। অনেক সময় নদীর প্রবল স্রোতে মানুষের জীবনহানিও ঘটে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় দশ লক্ষ মানুষ নদীভাঙনের শিকার হয়।

উপসংহার : নদ-নদী বাংলাদেশকে করেছে সমৃদ্ধ। এ দেশকে ঘিরে রেখেছে চারদিক থেকে। নদ-নদীগুলো এ দেশের গৌরব। তবে বর্তমানে সে গৌরব ম্লান হতে চলেছে। নদীগুলো ভরাট হয়ে হারিয়ে ফেলছে তাদের স্বাভাবিক গতিপথ। তাই এ বিষয়ে এখনই আমাদের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকা : 'থাকব না ক বদ্ধ ঘরে/ দেখব এবার জগৎটাকে

কেমন করে ঘুরছে মানুষ/ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।'

(*সংকল্প : কাজী নজরুল ইসলাম*)

অনেক খ্যাতিমান কবির কবিতায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। তবে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম। তিনি বিদ্রোহী কবি, মানবতার কবি, প্রেমের কবি। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষ বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান কোনো দিন ভুলবে না।

কবির জন্মপরিচয় : ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জৈষ্ঠ্য) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জায়েদা খাতুন। ছেলেবেলায় নজরুলের নাম ছিল দুঃখু মিয়া।

কবির শিক্ষাজীবন : ছোট থেকেই নজরুল ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। গ্রামের মক্তব থেকে তিনি প্রাইমারি পাস করেন। এরপর তিনি ময়মনসিংহের ত্রিশালের দরিরামপুর হাইস্কুলে কিছুকাল পড়ালেখা করেন। তারপর তিনি ভর্তি হন বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে। এখানে দশম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্টে সৈনিক হয়ে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেন। নজরুলের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার এখানেই ইতি ঘটে।

কবির কর্মজীবন : নজরুল বারো বছর বয়সে লেটোর গানের দলে যোগ দেন। সেখান থেকে তিনি সামান্য কিছু রোজগার করতেন। এরপর তিনি আসানসোলের এক রুটির দোকানে মাসিক এক টাকা বেতনে চাকরি নেন। বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর কাব্যসাধনায় তিনি পুরোপুরি নিয়োজিত হন। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় নবযুগ, লাঙল ও ধূমকেতু পত্রিকা। পত্রিকাগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল।

কবির কাব্যপ্রতিভা : ১৯২০ সাল থেকে নজরুল পুরোপুরি সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম 'মুক্তি'। কিন্তু যে কবিতা তাঁকে খ্যাতি এনে দেয় তার নাম 'বিদ্রোহী'। পরবর্তীকালে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি রচনা করে তিনি ব্রিটিশ শাসকদের ব্যঙ্গ করেছিলেন। এ কারণে তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছে।

সাহিত্যকীর্তি : কাজী নজরুল ইসলাম খুব অল্প সময় সাহিত্য সাধনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার মধ্যেই তিনি রচনা করেছিলেন অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, চক্রবাক, দোলনচাঁপা, ফণীমনসা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং কুহেলিকা, মৃত্যুক্ষুধা প্রভৃতি উপন্যাস। তিনি প্রায় দুই হাজারের মতো গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের সুরের বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। মানুষ এখনো শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর গান শোনে।

সংবর্ধনা, সম্মাননা ও পুরস্কার : ১৯২৯ সালে কলকাতা অ্যালবার্ট হলে নজরুলকে জাতির পক্ষ থেকে সম্মাননা জানানো হয়। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে নজরুলকে সভাপতির পদে সমাসীন করে সম্মান দেখানো হয়। ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করে। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৫ সালে তাঁকে ডি.লিট. উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন।

কবির অসুস্থতা : ১৯৪২ সালে কবি মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হলেও সুস্থ হননি তিনি। এর পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন নির্বাক।

কবির বাংলাদেশে আগমন : ১৯৭২ সালে অসুস্থ কবিকে ঢাকায় আনা হয়। পরে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং জাতীয় কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়।

মৃত্যু : বাংলাদেশে অবস্থানকালে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট কবি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়। প্রতিবছরই তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর সমাধিতে সবাই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

উপসংহার : বাঙালির গর্ব নজরুল। বাঙালির প্রিয় কবি নজরুল। তিনি তাঁর সৃষ্টির দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব পেয়েছেন। বাঙালি জাতি চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। তাঁর সাহিত্য যুগ যুগ ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আমাদের প্রেরণা জোগাবে। নজরুল শুধু একটি সময়ের কবি নন। তিনি সব সময়ের সব মানুষের কবি।

কী ধরনের বই আমার পড়তে ভালো লাগে

ভূমিকা : গল্পকার ও ঔপন্যাসিক মাক্সিম গোর্কি বলেছেন, 'আমার মধ্যে উত্তম বলে যদি কিছু থাকে তার জন্য আমি বইয়ের কাছে ঋণী।' সত্যিকার অর্থেই বই মানুষের মধ্যে ইতিবাচক ভাবনার জন্ম দেয়। মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে। তাই তো বই আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

আমার বই পড়ার শুরুর কথা : মায়ের কাছ থেকে বর্ণমালা শেখার পর পাঁচ বছর বয়সে আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্কুলের পাঠ্যবই তখন আমার সঙ্গী হয় । কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই আমি বই পড়তাম। ছোটবেলায় 'ঠাকুরমার ঝুলি' আমাকে খুব আনন্দ দিত। এ গল্পগুলো আমি নিজে পড়ে যতটা আনন্দ পেতাম, তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পেতাম শুনে। এ ছাড়া ঈশপের গল্প, মোল্লা নাসিরউদ্দীনের গল্প, বীরবলের গল্প ও গোপাল ভাঁড়ের গল্প আমার পড়তে ভালো লাগত। কিন্তু এখন আমি এ রকম বই পড়ি না। গোয়েন্দা গল্প, মুক্তিযুদ্ধের গল্প ছাড়াও আরও নানা রকমের গল্পের বই এখন আমার নিত্যসঙ্গী।

আমার ভালো লাগার বই : গোয়েন্দা গল্প পড়তে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। গোয়েন্দা চরিত্রগুলোর মধ্যে 'ফেলুদা' আমার সবচেয়ে প্রিয়। অমর এ চরিত্রের স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়। ফেলুদাকে নিয়ে সত্যজিৎ রায় অনেকগুলো গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জয় বাবা ফেলুনাথ, কলকাতায় ফেলুদা, বাক্স রহস্য, সোনার কেল্লা, রয়েল বেঙ্গল রহস্য, শেয়াল রহস্য ইত্যাদি। গল্পগুলো যখন আমি পড়ি, তখন আমার মধ্যে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে আমি নিজেকে গল্পের চরিত্র হিসেবেও ভাবতে শুরু করি। ফেলুদার সঙ্গে থাকা তপেসের চরিত্র এ ক্ষেত্রে আমাকে খুবই আকর্ষণ করে। আর জটায়ুর চরিত্র আমাকে আনন্দ দেয়। তবে ফেলুদার চরিত্র এককথায় অসাধারণ। গল্পগুলো যখন আমি পড়ি, তখন সময় কোন দিক দিয়ে কেটে যায় আমার মনেই থাকে না। সব কাজ ভুলে গল্পগুলোর মধ্যে আমি নিজেকে ডুবিয়ে রাখি। যতক্ষণ একটি গল্প পড়া শেষ না হয়, ততক্ষণ আমি বই ছেড়ে উঠতে পারি না। এক কল্পনার জগতের মধ্যে গল্পগুলো আমাকে টেনে নিয়ে যায়।

আমার অন্যান্য বইয়ের সংগ্রহ : গোয়েন্দা গল্প ছাড়াও আমার সংগ্রহে মুক্তিযুদ্ধের বই, ইতিহাসের বই, সায়েন্স ফিকশন, গণিতের বই ও ম্যাজিক শেখার বই রয়েছে। গোয়েন্দা গল্প পড়ার পাশাপাশি এ বইগুলো পড়তেও আমার ভালো লাগে।

বই পড়ে আমার প্রাপ্তি : আনন্দ পাওয়ার জন্যই আমি মূলত বই পড়ি। তবে গোয়েন্দা গল্পগুলো আমাকে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক হতে সাহায্য করেছে। আমার চারপাশের অজানা জগৎ সম্পর্কে আমাকে ধারণা দিয়েছে বই। বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বই। বই পড়ে আমি মানুষের মন ও তার চিন্তা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা পেয়েছি। ভবিষ্যতে এ জ্ঞান আমাকে পথ চলতে সাহায্য করবে। আমার পরিবার, বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের কাছে আমাকে আদরণীয় করেছে বই।

উপসংহার : বই আমাকে সব সময় সৎ পথে চলতে সাহায্য করে। আমার মন খারাপ হলে বন্ধুর মতো আমার পাশে থেকে বই আমাকে সাহায্য করে। বই পড়ে আমি মানুষের জন্য ভালো কিছু করার প্রেরণা পাই। জ্ঞান ও বুদ্ধিতে মানুষকে শাণিত হতে হলে বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রত্যেকেরই বই পড়া উচিত।

আমার চারপাশের প্রকৃতি

ভূমিকা : সবুজের চাদরে ঢাকা আমাদের এই দেশ। এ দেশের প্রাকৃতিক শোভা আমাদের মুগ্ধ করে। এ দেশের প্রকৃতির রূপ বড় বিচিত্র। এ দেশের নদী, মাঠ, অরণ্য, আকাশ, পাহাড় দেখে আমরা পুলকিত হই। আমাদের মাতৃভূমি তার অপরূপ ঐশ্বর্য ও সম্পদে অনন্য।

চারপাশের প্রকৃতি : আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা গ্রামের পরিবেশে। এখানকার মাঠ, ঘাট, বন ও প্রান্তর সবকিছুর সঙ্গেই আমার আত্মার সম্পর্ক। তাই এ প্রকৃতি আমার কাছে অন্য সব স্থানের চেয়ে অনেক বেশি আপন।

বন-বনানী : আমার চারদিকে সবুজের সমারোহ। যেদিকে তাকাই সেদিকেই ঘন সবুজ। আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল, বট, শাল, সেগুন, মেহগনি, কড়ইসহ আরও কত গাছ। এসব গাছগাছালি মিলে চারপাশে একটা বনের মতো সৃষ্টি হয়েছে। কবি জসীমউদ্‌দীনের ভাষায় :

বনের পরে বন চলেছে বনের নাহি শেষ,

ফুলের ফলের সুবাস ভরা এ কোন পরীর দেশ

বর্ষার দিনে যখন এ বনে বৃষ্টি আসে, তখন মনে হয় প্রকৃতি যেন তার দুহাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছে। আবার শীতের দিনে যখন গাছগুলোর পাতা ঝরে পড়ে, তখন প্রকৃতিকে অসহায় মনে হয়। বসন্তে নতুন পাতা এলে গাছগুলো নতুন সাজে সেজে ওঠে। শুধু বড় গাছগুলোই নয়, ছোট গাছগুলোও অপরূপ শোভা সৃষ্টি করে চারপাশে।

মাঠ-প্রান্তর : বনের দিক থেকে চোখ ঘোরাতেই ধানখেত সামনে এসে পড়ে। যখন তার উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায়, তখন মনে হয় সবুজের সমুদ্র বুঝি হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পাটক্ষেতের পাটগাছগুলোও বেশ বড় হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মনটা আনন্দে ভরে যাচ্ছে। গমখেতের গমগুলো পেকে উঠেছে। তার উপর যখন সূর্যের আলো পড়ছে, তখন সোনালি আলোয় চারদিক ভরে যাচ্ছে। এ মাঠেই শীতের সময় ফোটে সর্ষেফুল। তখন চারদিক হলুদ হয়ে ওঠে। মৌমাছির দল এসে তখন সেখান থেকে মধু সংগ্রহ করে।

জলাশয় : মাঠ পার হয়ে রাস্তায় আসতেই একটা বড় পুকুর চোখে পড়ে। পুকুরের চারদিকে নারিকেল ও কলাগাছ লাগানো। পানি কাচের মতো স্বচ্ছ। তার এক কোণে ফুটে আছে শাপলা ফুল। মাঝে মাঝে একটা দুটো মাছ লাফ দিচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে। দুটো ছেলে অনেক উঁচু একটা গাছের ডাল থেকে পুকুরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ঢেউ বয়ে গেল। পুকুরপাড় দিয়ে সামনে আসতেই একটা বিল চোখে পড়ে। বিলে অনেক পানি। জেলেরা সেখানে জাল দিয়ে মাছ ধরছে। বিলের পানিতে হালকা হালকা ঢেউ। তবে বর্ষায় এমন থাকে না। তখন অনেক বড় বড় ঢেউ এপার থেকে ওপার অবধি বয়ে যায়। বিলের ওপরে কিছু নৌকা ভেসে চলেছে। কিছু মানুষ বিলের এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে।

পশুপাখি : গাঙশালিক, বক, বেলে হাঁস, মাছরাঙা ছাড়াও বিলের ধারে রয়েছে আরও অনেক পাখি। রাতে মাঝে মাঝে দু-একটা মেছো বাঘ বিলের ধারে দেখা যায়। এ ছাড়া সবুজ ধানখেতে ও গাছের মাথায় ছুটে আসে টিয়া, চড়ুই, শালিক, ঘুঘু, বুলবুলি, ফিঙে, দোয়েলসহ আরও অনেক পাখি। ঘন সবুজ গাছের আড়ালে মাঝে মাঝে দু-একটা শেয়াল দেখা যায়। তবে সাপ, বেজি, বনবিড়াল সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।

রাতের আকাশ : রাতের আকাশ দেখে মনে হয় এ যেন স্বর্গের লীলাভূমি। অগণিত তারা রাতের আকাশকে উজ্জ্বল করে তোলে। পূর্ণিমার সময় চাঁদের আলোয় ঝলমল করে চারপাশ। আবার অমাবস্যার রাতে চারদিকে কালো অন্ধকারে ভরে যায়। তখন জোনাকির আলোয় মানুষ পথ চিনে ঘরে ফেরে।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত : প্রকৃতি জেগে ওঠে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। কাকডাকা ভোরে মানুষ ঘুম থেকে উঠে আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সারা দিন পর আকাশ রাঙিয়ে যখন সূর্যাস্ত হয়, তখন প্রকৃতির কোলে যে যার স্থানে ফিরে যায়।

উপসংহার : আমার চারপাশের প্রকৃতি চোখ জুড়ানো ও মন ভুলানো। তাই যে একবার এ প্রকৃতির মাঝে আসে, সে আর এখান থেকে যেতে চায় না। খুঁজতে চায় না অন্য কোনো রূপ। কবি জীবনানন্দের ভাষায় :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর

এ দেশের প্রকৃতি ও এর সৌন্দর্য আমার গর্ব। আমি আমার দেশকে খুব ভালোবাসি।

আমার দেখা একটি মেলা

সূচনা : মেলা শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আক্ষরিকভাবে মেলা শব্দের অর্থ হলো 'মিলন'। মেলায় পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা হয় এবং ভাববিনিময় হয়। একের সঙ্গে অন্যের সংযোগ ঘটে মেলায়। আমাদের সংস্কৃতিতে মেলার গুরুত্ব অসীম।

মেলার প্রচলন : অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে মেলার প্রচলন ছিল। তবে তখন মেলার আয়োজন হতো সুনির্দিষ্ট কিছু স্থানে এবং বৃহৎ পরিসরে। বর্তমানে দেশের প্রায় সব স্থানেই মেলা হয়। কোনো কোনোটির আয়োজন অনেক বড়, আবার কোনোটির ক্ষুদ্র। তবে মেলার আনন্দ এখন আগের মতোই রয়েছে।

মেলার উপলক্ষ্য: আমাদের দেশে বেশির ভাগ মেলা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, রথযাত্রা, দোল উৎসব, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের ১০ই মহরমকে কেন্দ্র করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধদের বৌদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া চৈত্রসংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমার দেখা মেলার উপলক্ষ্য ছিল পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ।

মেলার স্থান : সাধারণত খোলা কোনো বৃহৎ স্থানে, যেখানে মানুষের চলাচল রয়েছে, তেমন স্থানেই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সময় স্কুলমাঠেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তবে আমি যে মেলাটি দেখেছি, সেটি বসেছিল নদীর ধারের একটি বৃহৎ বটগাছের নিচে।

মেলার প্রস্তুতি : পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাঙালির সবচেয়ে আনন্দের দিন। এদিনকে উপলক্ষ্য করে মেলার প্রস্তুতিও ছিল বিশাল। অস্থায়ীভাবে বটগাছের চারদিকে দোকানপাট তৈরি করা হয়। একদিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যাত্রাপালার জন্য একটি বড় মঞ্চ তৈরি করা হয়। কিছু কিছু মানুষ মূল স্থানে জায়গা না পেয়ে রাস্তার পাশে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে বসার প্রস্তুতি নেয়। মঞ্চের চারদিকে মাইক লাগানো হয়।

মেলার চিত্র : পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মেলা শুরু হয়। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেলার সূচনা করেন। মেলা শুরু হতেই এতে জনস্রোত দেখা যায়। যে দোকানগুলো কাল পর্যন্ত খালি ছিল তা আজ কানায় কানায় নানা দ্রব্যসামগ্রীতে ভরে যায়। মানুষ রঙিন পোশাক পরে মেলায় প্রবেশ করে। ছোট ছেলেমেয়েদের চোখেমুখে আনন্দের ঝলক দেখা যায়। বৃদ্ধরাও ভিড় এড়িয়ে মেলায় প্রবেশ করতে থাকে। মেলার চারদিকে প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ করা যায়। প্রতিটি দোকানে মানুষ তাদের পছন্দের ও প্রয়োজনের জিনিসপত্র কিনতে শুরু করে। ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড় করে মাটির খেলনা, বেলুন, বাঁশি আরও নানা জিনিসের দোকানে। নারীরা ভিড় করে প্রসাধনসামগ্রী ও চুড়ির দোকানে। এ ছাড়া কাপড়ের দোকানেও ভিড় লক্ষ করা যায়। পুরুষেরা তাদের পোশাকের দোকানের সামনে ভিড় করে। মেলার এদিকে মিষ্টির দোকান লক্ষ করা যায়। এখানে গরম জিলিপি কিনতে সবাই ভিড় করে। এ ছাড়া ছোলাভাজা, বাদামভাজা, পাঁপরভাজা, ভুট্টার খই, কনক ধানের খই, মুড়কি, বাতাসা, হাওয়াই মিঠাই ও নানা রকমের মিষ্টি পাওয়া যায় মেলায়। সবাই এগুলো খেতে খেতে মেলায় ঘুরে বেড়ায়। মেলার একদিকে একটি লোক সাপের খেলা দেখাচ্ছিল। তা দেখতে ভিড় করে অসংখ্য মানুষ। এ ছাড়া ছোটখাটো একটা সার্কাসের আয়োজনও ছিল।

মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যার সময় মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় শিল্পীদের গান পরিবেশনের পর শুরু হয় যাত্রাপালা। মঞ্চে ভেলুয়া সুন্দরীর পালা পরিবেশন করা হয়। যাত্রাপালায় ভেলুয়া সুন্দরীর জীবনের দুঃখ দেখে অনেকেই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্তৃপক্ষ মেলার ইতি টানে।

মেলার তাৎপর্য : মেলায় মানুষের সম্প্রীতির এক বন্ধন তৈরি হয়। স্থানীয়ভাবে তৈরি জিনিসের একটি প্রদর্শনী হয় মেলায়। মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে মেলায় এসে। শুধু তাই নয়, এখানে অর্থনৈতিক বিষয়ও যুক্ত থাকে। একদল মানুষের উপার্জনের মূল উৎস হলো মেলা। এ ছাড়া ক্রেতারাও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য মেলার ওপর নির্ভর করে। অনেকে মেলাকে ঘিরে বছরের বিকিকিনির বড় পরিকল্পনাও করে থাকে।

উপসংহার : বাঙালি সংস্কৃতির বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে মেলা। মেলা সাধারণ কোনো আয়োজন নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের প্রথা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। মেলার মধ্য দিয়ে একশ্রেণির জীবন ও জীবিকা গড়ে উঠেছে। শুধু গ্রামেই নয়, শহরেও মেলা আনন্দের উৎস। তাই তো মেলার দিনে মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। মানুষকে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে সমবেত করতে মেলার কোনো বিকল্প নেই। তাই তো মেলা আজও আমাদের কাছে এত আকর্ষণীয়।

একটি দিনের দিনলিপি

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে একটি দিনের সূত্রপাত হয়। আবার সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দিনটি শেষও হয়ে যায়। একটি দিন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি অতীত হয়ে যায়। কিছু স্মৃতি কিছু ঘটনা প্রতিদিনই আমাদের মনে জমা হয়। আর এভাবেই পার হয় আমাদের দৈনন্দিন জীবন।

আজ ২ জানুয়ারি। আমি সপ্তম শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছি। গত ২১ ডিসেম্বর আমার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল দিয়েছে। আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি। বাড়ির সবাই বেশ খুশি হয়েছে। আজ সপ্তম শ্রেণিতে আমার প্রথম ক্লাস হলো। স্কুল একই কিন্তু ক্লাসরুম ভিন্ন। স্কুলের সবাইকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। সবার পরনে নতুন স্কুল ড্রেস। কাঁধে নতুন স্কুল ব্যাগ। আর ব্যাগভর্তি নতুন ক্লাসের বই।

স্কুলে আমার প্রথম ক্লাস ছিল বাংলা। জলিল স্যার সবার পরিচয় নিয়ে বাংলা পড়ালেন। ষষ্ঠ শ্রেণিতেও স্যার বাংলা পড়াতেন। স্যারের কণ্ঠ ও উচ্চারণ আমাকে মুগ্ধ করে। এরপর কাঁকন ম্যাডাম ক্লাস নিলেন। তিনি আমাদের ইংরেজি পড়ালেন। তারপর গণিত ও ধর্ম ক্লাস হলো এবং টিফিনের ঘণ্টা পড়ল। টিফিনে আমি রিংকুর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। রিংকু আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। বার্ষিক পরীক্ষায় আমার থেকে নম্বর কম পেলেও ও আমার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও মেধাবী । ও আমার টিফিন থেকে কিছুটা ভাগও বসাল।

টিফিনের পর আমার বিজ্ঞান ক্লাস শুরু হলো। কালাম স্যার আমাদের অণুর গঠন পড়ালেন। বিজ্ঞানের জটিল জটিল বিষয়গুলো স্যার খুব সহজ করে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। এ কারণে ক্লাসের সবাই তাকে খুব পছন্দ করে। এরপর স্বপন স্যারের সমাজ ক্লাস শেষে আমাদের ছুটি হলো। রিকশায় চড়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

বাড়ি এসে দেখি মা আমার জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছেন। মা আমাকে স্কুলের কথা জিজ্ঞেস করলেন এবং সবার খোঁজ-খবর নিলেন। এরপর আমি ছুটলাম মাঠের দিকে। সবার সঙ্গে ক্রিকেট খেললাম। আসার সময় সাগর ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হলো। সাগর ভাইয়া খুব ভালো। যেকোনো বিপদে তাকে ডাকলেই পাওয়া যায়।

বাড়িতে এসে দেখি বাবা অফিস থেকে ফিরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বাজার থেকে আমার জন্য এনেছেন গরম গরম জিলাপি। মা বাবার পাশে আমাকে বসতে বললেন। আমি বাবার পাশে বসতেই তিনি আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। ভাইবোনদের মধ্যে তিনি আমাকে একটু বেশিই ভালোবাসেন। আমাকে সারা দিনের কথা জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

বাবার সঙ্গে কথা শেষ করে আমি বাগানে গেলাম। অনেকগুলো গাঁদা আর ডালিয়া ফুলের চারা লাগিয়েছি বাগানে। সঙ্গে লাগিয়েছি দুটো গোলাপের চারা। একটা ডালিয়া গাছে কলি এসেছে। মনে হয়, লাল রঙের ফুল ফুটবে। গাঁদা গাছগুলোতেও কলি এসেছে। গোলাপগাছের গোড়ায় বেশ আগাছা জমেছে। আমি সব আগাছা পরিষ্কার করে সবগুলো গাছে পানি দিলাম।

সন্ধ্যার সময় হাতমুখ ধুয়ে আমি টেবিলে বসলাম। স্কুলব্যাগ থেকে এক এক করে সবগুলো বই নামালাম। হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলাম নতুন ক্লাসের বই। নতুন বইয়ে একধরনের গন্ধ থাকে। আমি প্রাণভরে সেই গন্ধ নিলাম। তারপর প্রতিটি বইয়ের প্রথম অধ্যায় উল্টে-পাল্টে দেখলাম। ঘণ্টা দুয়েক পর আমি টেবিল থেকে উঠে টেলিভিশন দেখতে গেলাম।

টেলিভিশনে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছিল। খেলায় টান টান উত্তেজনা। অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ভারত এক উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করল। খেলা শেষ হওয়ার পর বাবা সংবাদ শোনার জন্য চ্যানেল পরিবর্তন করলেন। বাবার সঙ্গে আমিও বসে বসে সংবাদ শুনলাম।

রাতে খাওয়ার জন্য সবাই একসঙ্গে টেবিলে বসলাম। খেতে খেতে বাবা অনেক মজার মজার গল্প করলেন। খাওয়া শেষ করে আমি ঘরে চলে এলাম। রাতে ঘুমানোর আগে আমি প্রতিদিনই বই পড়ি। আজ পড়লাম জুলভার্নের 'আশি দিনে বিশ্বভ্রমণ'। গল্পটা এত আকর্ষণীয় যে পড়া শেষ করতে ইচ্ছেই করছিল না। কিন্তু আমার তো আরেকটা কাজ বাকি। প্রতিদিনের সব কথা লিখে রাখা। এতক্ষণ পর্যন্ত যা লিখেছি, তা ছিল আমার আজকের সারা দিন। কাল আরও একটি নতুন দিন আসবে। ঘটবে আরও নতুন ঘটনা। আরও কিছু অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করবে আমার জন্য। সেগুলোও লেখা হবে আমার দিনপঞ্জির খাতায়।

শহিদ মিনার

ভূমিকা : **'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি**
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু গড়ায়ে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি'

প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাতফেরির এ গান গেয়ে আমরা শহিদ মিনারে যাই। সেখানে ফুল দিয়ে ভাষাশহিদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই। শহিদ মিনার এদিন ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। আমাদের মনে করিয়ে দেয় মায়ের ভাষা আমাদের কাছে কত আপন। এ ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতেই বাংলার ছেলেরা রাজপথে প্রাণ দিয়েছিল। তাদের স্মৃতি রক্ষার্থেই নির্মিত হয়েছে শহিদ মিনার।

শহিদ মিনার সৃষ্টির পটভূমি : ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ডাকা অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।'

এ ঘোষণার প্রতিবাদে ৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস, ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালিত হয়। সেখান থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হবে। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে শাসকগোষ্ঠী ২১ ফেব্রুয়ারিতে সকল প্রকার সভা, মিছিল, মিটিং ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ছাত্রজনতা এ বাধাকে অতিক্রম করে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে মিছিলটি আসতেই পুলিশ তার ওপর গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত, শফিউরসহ আরও অনেকে। তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থেই গড়ে ওঠে স্মৃতির শহিদ মিনার।

প্রথম শহিদ মিনার : ২১ ফেব্রুয়ারির শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছাত্রজনতা একটি শহিদ মিনার তৈরি করে। এ কাজে অংশ নেয় তিন শ ছাত্র ও দুজন রাজমিস্ত্রি। প্রথম শহিদ মিনার তৈরির জন্য সাইদ হায়দার একটি নকশা প্রণয়ন করেন। তাঁর নকশায় শহিদ মিনারের উচ্চতা নয় ফুট থাকলেও তৈরির পর এটির উচ্চতা হয় এগারো ফুট। শহিদ শফিউরের পিতা ২৪ ফেব্রুয়ারি এটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু কয়েক দিন পরই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ শহিদ মিনারটি ভেঙে ফেলে। তবে বাঙালির হৃদয় থেকে তারা এ মিনারের স্মৃতি মুছে দিতে পারেনি। কবি আলাউদ্দীন আল আজাদের ভাষায় :

ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক

একটি মিনার গড়েছি আমরা চার-কোটি পরিবার

আজকের শহিদ মিনার : বর্তমান শহিদ মিনারটির নকশা করেন স্থপতি হামিদুর রহমান। পরবর্তীকালে শহিদ মিনারটি আরও সংস্কার করা হয়। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আমরা যে শহিদ মিনারটি

দেখি সেটিই হামিদুর রহমানের চূড়ান্ত নকশার পরিপূর্ণ রূপ। প্রতিবছর মানুষ এ মিনারের সামনেই ভাষাশহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বর্তমানে এ শহিদ মিনারের আদলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

শহিদ মিনারের তাৎপর্য : শহিদ মিনারের স্তম্ভগুলো মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার তথা মা ও তাঁর শহিদ সন্তানের প্রতীক। মাঝখানের সবচেয়ে উঁচু স্তম্ভটি মায়ের প্রতীক। চারপাশের ছোট চারটি স্তম্ভ সন্তানের প্রতীক, যারা তাদের বুকের রক্ত ঢেলে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আমাদের জীবনে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শুভ তার সঙ্গে শহিদ মিনারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এটি শুধু একটি মিনার নয়, এটি আমাদের প্রেরণার প্রতীক। শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, মুক্তিযুদ্ধেও শহিদ মিনার আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। আমাদের যুদ্ধ জয়ের অন্যতম প্রেরণা একুশে ফেব্রুয়ারি। আমরা যখনই অন্যায়ের শিকার হই, তখনি শহিদ মিনার তার প্রতিবাদ করার জন্য আমাদের প্রেরণা জোগায়।

শহিদ মিনার ও আমাদের সংস্কৃতি : আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শহিদ মিনারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দেশে যখনই কোনো অন্যায় সংঘটিত হয়, তখনই শহিদ মিনারের সামনে থেকে তার প্রতিবাদ করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান হয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে। এমনকি কোনো জাতীয় বা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর পর তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে রাখা হয়।

উপসংহার : শহিদ মিনার আমাদের প্রেরণার উৎস। আমরা শহিদ মিনারের দিকে তাকিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ অতীতের কথা ভাবি। আর বর্তমান প্রজন্মের কাছে গর্ব করে সে কথাগুলো বলি। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেয়েছে। ভাষার জন্য আমাদের আত্মদানের ইতিহাস ছড়িয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী। শহিদ মিনার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বাঙালির সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবীর মানুষ আজ শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষা শহিদদের অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

টেলিভিশন

ভূমিকা : গ্রিক শব্দ 'টেলি' ও লাতিন শব্দ 'ভিশন' থেকে টেলিভিশন শব্দটি এসেছে। টেলি শব্দটির অর্থ হলো দূরত্ব আর ভিশন অর্থ দেখা। টেলিভিশন মানুষের খুব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এর মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের যেকোনো ঘটনা মুহূর্তেই আমাদের সামনে চলে আসে। বিনোদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন এখন অগ্রগণ্য। বর্তমান পৃথিবীতে টেলিভিশনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

টেলিভিশনের আবিষ্কার : ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী জন বেয়ার্ড ১৯২৬ সালে প্রথম টেলিভিশন আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কৃত টেলিভিশনকে আরও সংস্কার করে ব্রিটিশ ব্রড কাস্টিং ১৯৩৬ সালে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে টেলিভিশনের প্রচার করে। টেলিভিশন নিয়ে এখনো চলছে নানা গবেষণা। পূর্বের মতো টেলিভিশন এখন আর চোখে পড়ে না। পূর্বে যে টেলিভিশন ওজনে ও আয়তনে বৃহৎ ছিল, এখন তা আর তেমন নেই। বিজ্ঞানের

দ্রুত অগ্রগতির ফলে এখন এলসিডি, এলইডি, থ্রিডি ইত্যাদি প্রযুক্তির টেলিভিশন বাজারে দেখা যায়। এগুলো প্রযুক্তিগতভাবে এত উন্নত যে, এতে ছবি দেখে জীবন্ত মনে হয়। তাছাড়া এগুলো বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী।

টেলিভিশনের ব্যবহার : পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই টেলিভিশন ব্যবহার করা হয়। মূলত বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে টেলিভিশন চালু হয়েছে আজ থেকে প্রায় আটচল্লিশ বছর আগে। বিনোদনের পাশাপাশি আমাদের দেশে টেলিভিশনে গণশিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবার-পরিকল্পনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রচার করে থাকে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন : ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশন তার যাত্রা শুরু করে। তবে ১৯৮১ সাল থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন রঙিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে। ১৯৮৪ সালে চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় এবং তার পরে টাঙ্গাইলের তালিবাবাদে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। যার ফলে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে প্রেরিত দৃশ্য আমরা টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখতে পাই।

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল : বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কিছু বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চালু আছে। যেমন : এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, এনটিভি, বাংলাভিশন, একুশে টেলিভিশন, বৈশাখী টেলিভিশন, সময় টেলিভিশন, আরটিভি, মোহনা টেলিভিশন, মাছরাঙা টেলিভিশন, চ্যানেল ২৪, দেশটিভি, একাত্তর (৭১) টিভি ইত্যাদি।

আমাদের জীবনে টেলিভিশনের উপযোগিতা : বর্তমানে মানুষের জীবনে টেলিভিশন বিনোদনের প্রধান মাধ্যম। মানুষ তার অবসর কাটায় টেলিভিশনের সামনে বসে। মনের ক্লান্তি দূর করে টেলিভিশন দেখে। একটি টেলিভিশন ঘরে থাকলে সারা দুনিয়ার ঘটনাকে হাতের মধ্যে পাওয়া যায়। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের সমস্ত খবর আমরা টেলিভিশনের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। জনকল্যাণ ও জনসচেতনতামূলক যেকোনো অনুষ্ঠান টেলিভিশনের মাধ্যমেই প্রচার করা হয়ে থাকে। শিক্ষাবিষয়ক অনুষ্ঠানগুলোও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। টকশোগুলোতে বিভিন্ন মতামত প্রচারিত হয়।

টেলিভিশনের নেতিবাচকতা : টেলিভিশন যেমন আমাদের আনন্দ দান করে, তেমনি এর কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। অধিক সময় টেলিভিশন দেখলে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে পারে। মাঝে মাঝে টেলিভিশনে ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পরিপন্থি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এ অনুষ্ঠানগুলো তরুণ মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

উপসংহার : বিজ্ঞান আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। বিজ্ঞানের যুগে সবাই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে। দুনিয়ার সব খবর এখন মানুষের মুঠোর মধ্যে। টেলিভিশন এ কাজকে আরও সহজ করে দিয়েছে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে টেলিভিশন হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। তবে টেলিভিশনে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু নীতিমালা থাকা উচিত, যা আমাদের কিশোর-তরুণদের সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে।

শৃঙ্খলাবোধ

সূচনা : 'Man is born free, but everywhere he is in chain'—মহান দার্শনিক রুশোর এ বক্তব্যের অর্থ হলো, মানুষ মুক্তভাবে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেও প্রতি পদেই সে শৃঙ্খলিত। এ পৃথিবীর সবকিছুই প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা। প্রকৃতির নিয়মের সামান্যতম ব্যত্যয় ঘটলেই মানবজীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। নিয়ম মেনেই প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। আসে দিন আসে রাত।

শৃঙ্খলাবোধের স্বরূপ : শৃঙ্খলাবোধ বলতে সাধারণত জীবনযাপনে নিয়মনীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি অনুগত থাকাকে বোঝায়। সমাজজীবনে কোনো মানুষই আপন খেয়াল অনুযায়ী চলতে পারে না। নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই তাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থেকে জীবন পরিচালনাই হলো শৃঙ্খলাবোধ।

শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব : মানবজীবনের জন্য শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। শৃঙ্খলার কারণেই মানবজীবনে সুখ-শান্তি নেমে আসে। স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি কখনোই সুখী হতে পারে না। সে শুধু নিজেরই নয়, সমাজেরও শান্তি নষ্ট করে। শৃঙ্খলাহীন জীবন লক্ষ্যহীন নৌকার মতো পানিতে ভেসে বেড়ায়। তার কোনো ঠিকানা থাকে না। মানুষ যদি নিজের ভেতর শৃঙ্খলা ধারণ করতে না পারে, তবে সমাজেও নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। তাই সুখী জীবনযাপনের জন্য শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই।

শৃঙ্খলা চর্চার সময়: শৈশব হলো শৃঙ্খলা চর্চার উপযুক্ত সময়। নিয়ম মানেই শৃঙ্খলা। এটি রপ্ত করে চর্চার মাধ্যমে জীবনকে সুখী করা যায়। মানবজীবনে সফলতার চাবিকাঠি হলো শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার ফলেই মানুষ সমাজের আচরণবিধি মেনে চলে এবং সফলভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা : ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা বিশেষ গুরুত্ব পালন করে। কারণ এ সময়েই ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ রোপিত হয়। শৃঙ্খলাবোধ একজন ছাত্রকে দায়িত্বশীল করে তোলে। পড়াশোনার প্রতি তার মনোযোগ বৃদ্ধি করে। ভবিষ্যতে শৃঙ্খলাবোধই তাকে সুনাগরিক হতে সাহায্য করে।

মানবজীবনে শৃঙ্খলা : সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ উন্নত, কারণ সে নিয়মবদ্ধ জীবনযাপন করে। জীবনকে সার্থক করতে শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই। শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষ শুধু নিজের বা পরিবারের জন্য নয়, রাষ্ট্রের জন্যও সম্পদ। মানবজীবনে লক্ষ্যকে জয় করতে শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই।

সমাজজীবনে শৃঙ্খলা : আদিম যুগ থেকেই মানুষের সমাজে কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা হয়। বর্তমান যুগেও নিয়ম-শৃঙ্খলা সমাজের জন্য অপরিহার্য। সত্যিকার অর্থে নিয়ম-শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো সমাজ চলতে পারে না। নিয়মবদ্ধভাবেই সমাজের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। শৃঙ্খলাই সমাজকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলে। অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। সমাজকে সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই।

শৃঙ্খলা সৃষ্টির উপায় : পরিবার শৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র। একটি শিশু পরিবার থেকেই প্রথম শৃঙ্খলা শেখে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় বিদ্যালয়ে। শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুর শৃঙ্খলাবোধকে

জাগিয়ে তোলে। উত্তরোত্তর এ শৃঙ্খলাবোধের মধ্য দিয়েই শিশু একদিন উন্নত চরিত্রের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।

শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা : মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শৃঙ্খলা মেনে না চললে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তার জীবনে নেমে আসে পরাজয়ের গ্লানি। খুব সমৃদ্ধ কোনো সমাজ বা প্রতিষ্ঠানও শৃঙ্খলার অভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অতএব শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বিশৃঙ্খলার পরিণতি : বিশৃঙ্খলার পরিণতি ভয়াবহ। বিশৃঙ্খলতা শুধু ধ্বংসই ডেকে আনে। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিক যতই দক্ষ হোক না কেন, তাকে শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হয়। একমুহূর্তের বিশৃঙ্খলা তাকে এবং তার সহযোগীদের মারাত্মক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। খেলার মাঠে কোনো খেলোয়াড় যদি বিশৃঙ্খল আচরণ করে, তবে তার দল নিশ্চিত অর্থে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। বিশৃঙ্খলা এভাবেই মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

উপসংহার : একজন মানুষ, একটি সমাজ, একটি জাতি তখনই সভ্য হয়ে ওঠে, যখন তার মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একটি সভ্যতা তথা জাতি তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তার মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের অভাব দেখা গিয়েছে। শৃঙ্খলাহীন মানুষের যেমন কোনো মর্যাদা নেই, তেমনি শৃঙ্খলাহীন জাতিরও কোনো সম্মান নেই। এ কারণেই সমাজজীবনে শৃঙ্খলা এত অত্যাবশ্যকীয়।

সুন্দরবন

ভূমিকা : সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এ বনের ৬২ শতাংশ বাংলাদেশের খুলনা জেলায় এবং বাকি ৩৮ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগনা জেলায় অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুন্দরবন অতুলনীয় এবং জীববৈচিত্র্যে অসাধারণ। সুন্দরবন একটি একক ইকো সিস্টেম। এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছেও একটি আকর্ষণীয় স্থান।

সুন্দরবনের আয়তন ও অবস্থান : আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর পূর্বে সুন্দরবন ১৬,৭০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর আয়তন সংকুচিত হয়ে গেছে। বর্তমানে এ বনভূমির আয়তন ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার। সমস্ত সুন্দরবন দুটি বন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

সুন্দরবনের ভূতত্ত্ব, মৃত্তিকা ও জলবায়ু : সুন্দরবনের ভূভাগ হিমালয় পর্বতের ভূমিক্ষয়জনিত জমা পলি থেকে সৃষ্টি। ভূ-বিজ্ঞানীরা এখানকার ভূমির গঠনবিন্যাসে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সামান্য ঢালের সন্ধান পেয়েছেন। কূপ খনন গবেষণা থেকে দেখা যায়, সুন্দরবনের পশ্চিম এলাকা তুলনামূলক স্থির। তবে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একটি অংশ ক্রমেই নিম্নমুখী হচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরের তুলনায় সুন্দরবনের মাটি একটু আলাদা

ধরনের। জোয়ার-ভাটার কারণে এখানকার পানিতে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা বেশি। এখানকার মাটি পলিযুক্ত দোঁ-আশ।

সুন্দরবনের উদ্ভিদ : সুন্দরবনের উদ্ভিদকুল বৈচিত্র্যময়। এখানকার অধিকাংশ গাছপালা ম্যানগ্রোভ ধরনের। এখানে রয়েছে বৃক্ষ, লতাগুল্ম, ঘাস, পরগাছা ইত্যাদি উদ্ভিদ। উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডি.প্রেইন সুন্দরবনে ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ আছে বলে উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সন্ধানপ্রাপ্ত ৫০টি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরবনেই আছে ৩৫টি। সুন্দরবনের উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, ধুন্দল, বাইন প্রভৃতি। এ ছাড়া সুন্দরবনের প্রায় সবখানেই জন্মে গোলপাতা।

সুন্দরবনের প্রাণী : বিচিত্র সব প্রাণীর বাস সুন্দরবনে। এখানে রয়েছে বহু প্রজাতির স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী এবং শত শত প্রজাতির পাখি ও মাছ। সুন্দরবনের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। এ ছাড়া রয়েছে চিত্রা ও মায়া হরিণ, বানর, বনবিড়াল, লিওপার্ড, শজারু, উদ এবং বন্য শূকর। এখানে রয়েছে বিচিত্র সব পাখি। বক, সারস, হাড়গিলা, কাদাখোঁচা, লেনজা ও হট্টিটি এখানকার নদী-নালা ও গাছপালার মাঝে বসবাস করে। সমুদ্র উপকূলে দেখা যায় গাঙচিল, জল কবুতর, টার্ন ইত্যাদি। এ ছাড়া চিল, ঈগল, শকুন, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, ভগীরথ, পেঁচা, মধুপায়ী, বুলবুলি, শালিক, ফিঙে, ঘুঘু, বেনে বৌ, হাঁড়িচাঁচা, ফুলঝরি, মুনিয়া, টুনটুনি, দোয়েল, বাবুই প্রভৃতি পাখি সুন্দরবনে বাস করে। সুন্দরবনের সরীসৃপদের মধ্যে রয়েছে কুমির, সাপ, টিকটিকি-জাতীয় সরীসৃপ ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুন্দরবনের অবস্থান : সুন্দরবনে প্রাপ্ত কাঠ জ্বালানি ও কাঠকয়লা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া ম্যানগ্রোভের ফল গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গোলপাতা শুকিয়ে ঘরের চাল ও বেড়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনে যে শামুক-ঝিনুক পাওয়া যায়, তা খাবার চুনের ভালো উৎস। সুন্দরবনের মধুর ওপর নির্ভর করে একশ্রেণির মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। দেশে বিক্রির পাশাপাশি এ মধু বিদেশেও রপ্তানি হয়। মৎস্যজীবীরা সুন্দরবন থেকে মাছ ধরে তা স্থানীয় বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করে। সুন্দরবনের বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে কয়েকটি শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে খুলনা নিউজপ্রিন্ট ও হার্ডবোর্ড মিলস উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে সুন্দরবনের অবস্থা : সুন্দরবনের বনজ সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মানুষ অহরহ প্রবেশ করছে এখানে। ফলে এর ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এ ছাড়া লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে ম্যানগ্রোভও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের শেষ আবাসস্থল সুন্দরবন। চোরা শিকারিদের হামলায় বাঘের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক আইলায় সুন্দরবন ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

উপসংহার : সুন্দরবন আমাদের ঐতিহ্য। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে উন্নত করতে সুন্দর বনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন। তাই আমাদের উচিত সুন্দরবন ও এর প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে উদ্যোগী হওয়া।

অনুধাবন দক্ষতা

লিখিত কোনো বিষয় সাধারণভাবে আমরা অনেকেই পড়ে থাকি। কিন্তু সেই অংশটুকু পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পারাকে বলে অনুধাবন দক্ষতা। একটি পাঠে কিছু শব্দ থাকে, কিছু নতুন বিষয় থাকতে পারে, যার অর্থ বা ধারণা জানা না থাকলে পাঠটির পূর্ণ ধারণা লাভ সহজ হয় না। তাই একটি পাঠ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে পাঠসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ও জানতে, বুঝতে হয়। আবার তা কেবল মুখস্থ করলে সেটি বেশি দিন মনে না-ও থাকতে পারে। সেই জানা জ্ঞান অন্য কোনো পাঠের সাথে বা জ্ঞানের সাথে মেলাতে পারার ক্ষমতাও থাকতে হয়। এভাবেই অনুধাবন দক্ষতা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়। অনুধাবন দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য একটি অনুচ্ছেদ দেওয়া হয়। অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এর জন্য নম্বর বরাদ্দ থাকে ১x৫=৫।

অনুধাবন পরীক্ষা :

পৃথিবী, নির্ঝর, অর্ক, মৃত্তিকা, শ্রাবণী, সৃষ্টি ও অত্রি শীতের ছুটিতে চরকাবায় বেড়াতে গিয়েছে। ওরা ভাই-বোন মিলে এলাকাটির সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখল। ওখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও একটি বাজার আছে। এলাকার অধিকাংশ জনগণই শিক্ষিত। কৃষিজীবী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ীসহ নানা পেশার মানুষ সেখানে বসবাস করেন। বেশ কিছু লোক জীবিকার তাগিদে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপসহ নানা দেশে চাকরি নিয়ে গেছেন। এলাকার জনগণ মোটামুটি সচ্ছল। বৈদেশিক অর্থ লেনদেনের জন্য ওখানে বেশ কিছু ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনো কোনো বাড়িতে ফুলের বাগানও রয়েছে। চরকাবা এলাকাটি বাংলাদেশের একটি আদর্শ গ্রামীণ এলাকা।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. জীবিকা শব্দের অর্থ কী?

খ. কৃষিজীবী কারা?

গ. সচ্ছল পরিবার বলতে কী বুঝায়?

ঘ. চরকাবায় কেন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়?

ঙ. আদর্শ গ্রাম বলতে কেমন গ্রামকে বুঝায়?

সারাংশ/সারমর্ম

কোনো পদ্য বা গদ্যের মূলভাব বা বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার নামই সারমর্ম বা সারাংশ। সাধারণত পদ্যের ভাব সংক্ষেপে প্রকাশকে সারমর্ম এবং গদ্যের বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে সারাংশ বলে। সারমর্ম বা সারাংশ লেখার সময় :

১. যে পাঠটুকুর সারমর্ম বা সারাংশ রচনা করতে হবে, সেটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।

২. বাড়তি বিষয় বর্জন করতে হবে। কখনো কোনো পাঠের মূল ভাব উপমা রূপকের আড়ালে থাকতে পারে, তা বুঝে মূল ভাব লিখতে হবে।

৩. সারাংশ বা সারমর্মে উপমা, রূপক—এসব বাদ দিয়ে লিখতে হবে।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তি বর্জন করে পরোক্ষ উক্তিতে লিখতে হবে।

৫. আমি, আমরা বা তুমি, তোমরা দিয়ে বাক্য শুরু করা যাবে না।

৬. মূল অংশে উদ্ধৃতি থাকলে প্রয়োজনে সেই উদ্ধৃতির ভাবটুকু উদ্ধৃতি ছাড়া লিখতে হবে।

এক.

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।
মুহূর্ত নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
রচে যুগ-যুগান্তর– অনন্ত মহান,
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
–এ ধরায় স্বর্গ সুখ নিত্য দেয় আনি।

সারমর্ম : পৃথিবীর কোনো কিছুই সামান্য নয়। ছোট ছোট বালুকণা যেমন মহাদেশ তৈরি করে, তেমনি বিন্দু বিন্দু জল মহাসাগরের জন্ম দেয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্তের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় যুগ-যুগান্তরের। সামান্য অপরাধের পথ ধরেই আসে মহাপাপ। সামান্য একটু করুণার ও স্নেহের বাণী এ পৃথিবীতে স্বর্গসুখ এনে দিতে পারে। তাই ছোট হলেই কোনো কিছু তুচ্ছ নয়।

দুই.

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক– মানুষেতে সুরাসুর–
রিপুর তাড়নে যখন মোদের বিবেক পায়গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।

সারমর্ম : স্বর্গ বা নরক দূরে কোথাও নয়। স্বর্গ ও নরক মানুষের মাঝেই বিরাজ করে। মানুষ যখন কোনো খারাপ কাজ করে অনুতপ্ত হয়ে যন্ত্রণায় ভোগে, তখন সেটাই নরকযন্ত্রণা। পরস্পরের প্রতি বিভেদ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বে মানুষ এই পৃথিবী নরকে পরিণত করে। যখন একে অন্যকে সব বৈরিতা ভুলে বিশুদ্ধভাবে ভালোবাসে, তখনই পৃথিবীতে নেমে আসে স্বর্গীয় সুখ।

তিন.

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সেই পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইলো যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

সারমর্ম : পৃথিবীর যত উন্নতি সবই শ্রমজীবী মানুষের দান। তাদের নিরলস সেবা ও শ্রমের কারণেই আমরা সুখী জীবন যাপন করি। তাদের এই শ্রমের মূল্য আমরা দেই না, তাদের দুঃখ-বেদনা অনুভব করতে চাই না। প্রকৃতপক্ষে তারাই সভ্যতার অগ্রযাত্রার কারিগর। তাই পরিশ্রমী মানুষ শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের জয়গান করা আমাদের কর্তব্য।

চার.

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা –
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিত্তে
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।।

সারমর্ম : কবি সৃষ্টিকর্তার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন না। কবি কামনা করেন, তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যেন তিনি যথাযথভাবে পালন করতে পারেন। বিপদ হতে রক্ষা, দুঃখে সান্ত্বনা, কর্মের ভার লাঘব তাঁর প্রত্যাশিত নয়। কবির কামনা বিপদকে, দুঃখকে, ভয়কে জয় করার মনোবল যেন তাঁর অটুট থাকে।

পাঁচ.

সময় ও স্রোত কাহারও অপেক্ষায় বসে থাকে না, চিরকাল চলিতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় করো, ইহাকে ভয় দেখাও ভ্রুক্ষেপও করিবে না, সময় চলিয়া যাইবে, আর ফিরিবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সময় একবার গত হইয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না গত সময় আর ফিরিয়া আসিবে না।

সারাংশ : সময় চিরবহমান। শত চেষ্টা করলেও সময়ের গতিকে কেউ রুদ্ধ করতে পারে না। চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে হয়তো লুপ্ত-স্বাস্থ্য বা ধ্বংস হওয়া ধন-সম্পদ পুনরায় উদ্ধার করা যায়। কিন্তু চলে যাওয়া সময়কে শত চেষ্টায়ও কখনোই ফিরিয়ে আনা যায় না।

ছয়.

অপরের জন্য তুমি প্রাণ দাও, আমি তা বলতে চাইনে। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর করো। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বলো। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটু করুণ চাহনি নিক্ষেপ করো, তাহলেই অনেক হবে। চরিত্রবান, মানবতাসম্পন্ন মানুষ নিজের চেয়ে পরের অভাবে বেশি অধীর হন, পরের দুঃখকে ঢেকে রাখতে গৌরববোধ করেন।

সারাংশ : মানুষের জন্য অনেক বড় কিছু করতে না পারলেও ছোট ছোট কাজের দ্বারাও আমরা মানুষের উপকারে আসতে পারি। সাধ্যমতো সহায়তা দিয়ে অন্যের মনে আশার সঞ্চার করতে পারি। মানবিক অচরণ দিয়ে অসহায় মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারি। এভাবেই মহৎ মানুষ তাঁদের মহত্ত্বের পরিচয় দেন।

সাত.

অভাব আছে বলিয়াই জগৎ বৈচিত্র্যময়। অভাব না থাকিলে জীব সৃষ্টি বৃথা হইতো। অভাব আছে বলিয়াই অভাব পূরণের জন্য এতো উদ্যম, এতো উদ্যোগ। আমাদের সংসার অভাবক্ষেত্র বলিয়াই কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলকেই স্থাণু, স্থবির হইতে হইতো, মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনাময় হইতো। মহাজ্ঞানীরা জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই তো আমরা সেবার সুযোগ পাইয়াছি। সেবা মানবজীবনের ধর্ম। দুঃখ আছে বলিয়াই সে সেবার পাত্র যত্রতত্র সদাকাল ছড়াইয়া রহিয়াছে। যিনি অন্নদান, বস্ত্রদান, জ্ঞানদান, বিদ্যাদান করেন তিনি যেমন জগতের বন্ধু, তেমনি যিনি দুঃখে আমাদের সেবার পাত্রে অজস্র দান করিতেছেন, তিনিও মানবের পরম বন্ধু। দুঃখকে শত্রু মনে করিও না, দুঃখ আমাদের বন্ধু।

সারাংশ : অভাব বা প্রয়োজনের কারণেই মানুষ সৃষ্টি করে। সৃষ্টির প্রেরণাই মানুষের কাজের উৎস। অভাব না থাকলে মানুষ অলস হয়ে যেত। দুঃখ আছে বলেই মহামানবগণ সেবার হাত প্রসারিত করেন। দুঃখে যিনি এগিয়ে আসেন, তিনি মানবের পরম বন্ধু। দুঃখের আগুনে পুড়েই মানুষ খাঁটি সোনা হয়। তাই দুঃখকে শত্রু ভাবা ঠিক নয়।

ভাবসম্প্রসারণ

আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় কখনো কোনো একটি বাক্যে বা কবিতার এক বা একাধিক চরণে গভীর কোনো ভাব নিহিত থাকে। সেই ভাবকে বিস্তারিতভাবে লেখা, বিশ্লেষণ করাকে ভাবসম্প্রসারণ বলে। যে ভাবটি কবিতার চরণে বা বাক্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। সাধারণত সমাজ বা মানবজীবনের মহৎ কোনো আদর্শ বা বৈশিষ্ট্য, নীতি-নৈতিকতা, প্রেরণামূলক কোনো বিষয় যে পাঠে বা বাক্যে বা চরণে থাকে, তার ভাবসম্প্রসারণ করা হয়। ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে রূপকের আড়ালে বা প্রতীকের ভেতর দিয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়, তাকে যুক্তি, উপমা, উদাহরণ ইত্যাদির সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে হয়।

ভাবসম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে যেসব দিক বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে :

এক. উদ্ধৃত অংশটুকু মনোযোগসহ পড়তে হবে।

দুই. অন্তর্নিহিত ভাবটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

তিন. অন্তর্নিহিত ভাবটি কোনো উপমা-রূপকের আশ্রয়ে নিহিত আছে কি না, তা চিন্তা করতে হবে।

চার. সহজ-সরলভাবে মূল ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

পাঁচ. মূল বক্তব্যকে প্রকাশরূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে।

ছয়. বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এক.

পিতামাতা গুরুজনে দেবতুল্য জানি,

যতনে মানিয়া চল তাহাদের বাণী।

মূলভাব : বাবা, মা ও অভিভাবকবৃন্দ আমাদের জীবন গঠন ও পরিচালনার জন্য যেসব উপদেশ দেন, সেগুলো মেনে চলা কর্তব্য।

সম্প্রসারিত ভাব :

পিতা-মাতা আমাদের জীবন দান করেন এবং অনেক কষ্ট করে লালন-পালন করেন। পিতা-মাতার সঙ্গে অন্য গুরুজনরাও আমাদের সুস্থ জীবন বিকাশে সহায়তা করেন এবং অনেক কষ্ট স্বীকার করে আমাদের বড় করে তোলেন। এঁরা সবাই বয়সে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, প্রজ্ঞায় আমাদের থেকে অনেক বড়। তাঁরা আমাদের স্নেহ করেন, ভালোবাসেন এবং সর্বদাই মঙ্গল কামনা করেন। অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা জানেন কী করলে আমাদের ভালো হবে। নবীনতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে এই কঠিন ও জটিল পৃথিবীর অনেক কিছুই আমাদের অজানা। সে জন্য পিতা-মাতা, গুরুজন ও বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের উপদেশ চলার পথে আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর তা না করতে পারলে জীবনে সফলতা আসবে না। প্রতি মুহূর্তে আমরা হোঁচট খাব। আমরা জানি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বায়েজিদ বোস্তামি কীভাবে গুরুজনদের আদেশ-উপদেশ পালন করেছেন। আর সে কারণেই তাঁরা আজ সকলের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হতে পেরেছেন। তাই পিতা-মাতা, গুরুজন আদর্শস্থানীয়, দেবতুল্য এবং আরাধনাযোগ্য। তাঁদের বাণী অনুসরণ করে নিজের জীবন গড়তে হবে এবং দেশ, জাতি তথা সমগ্র বিশ্বকে শাশ্বত কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

সিদ্ধান্ত : পিতা-মাতা, গুরুজন ও বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের উপদেশ মানলে নিজের জীবন সুন্দর ও বিকশিত হবে এবং দেশ ও জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারবে।

দুই.

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে

কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

মূলভাব : কাজই মানুষের পরিচয়কে ধারণ করে। মুখে বড় বড় কথা না বলে কাজ করলে সভ্যতার বিকাশ সাধন হবে।

সম্প্রসারিত ভাব : আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা অনেক কথা বলতে ভালোবাসে কিন্তু কাজের সময় তারা ফাঁকি দেয়। উপরন্তু কাজ শেষে তারা অন্যের সমালোচনা করে। এসব মানুষ সমাজের জন্য ক্ষতিকর। তারা সভ্যতার বিকাশে কোনো ভূমিকা রাখে না বরং এর অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু নিজে কাজ করলে এবং অন্যের কাজে সহায়তা করলে আমাদের দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। বিশ্বের

সব দেশেই শ্রমকে, কর্মকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। মহামানবদের জীবনী পাঠ করলে দেখা যায়,তাঁরা কর্ম ও নিষ্ঠা দিয়ে পৃথিবীতে নিজেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করে রেখেছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁরা সারা বিশ্বে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এখন থেকে চার দশকেরও অধিক সময় আগে নিল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডউইন অলড্রিন—এই তিনজন মানুষ ঐকান্তিক সাধনা, নিরলস শ্রম ও কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে চাঁদে অবতরণ করতে পেরেছিলেন। এই দুঃসাহসী কাজের জন্য তাঁরা আজও মানুষের কাছে বরণীয় হয়ে আছেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরা বিজ্ঞানকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদেরও উচিত তাঁদের পথকে অনুসরণ করে ভালো ও পুণ্যকর্ম করে নিজের, পরিবারের তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করা। আর যারা কাজ না করে বেশি কথা বলে, তাদের মানুষ বাচাল বলে। আর বাচালের সঙ্গ ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

সিদ্ধান্ত : আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করে কাজ ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে।

তিন.

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

মূলভাব : মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত রসাস্বাদন করতে পারে এবং এই ভাষায়ই তাদের প্রাণের স্ফূর্তি ঘটে।

সম্প্রসারিত ভাব : পৃথিবীর প্রায় সব জাতিরই নিজস্ব ভাষা আছে এবং এক ভাষা থেকে অন্য ভাষা আলাদা। আমরা ভাষার মাধ্যমে শুধু নিজের মনের ভাবই অন্যের কাছে প্রকাশ করি না, মাতৃভাষার সাহায্যে অন্যের মনের কথা, সাহিত্য-শিল্পের বক্তব্যও নিজের মধ্যে অনুভব করি। নিজের ভাষায় কিছু বোঝা যত সহজ, অন্য ভাষায় তা সম্ভব নয়। বিদেশে গেলে নিজের ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায় আরও প্রখরভাবে। তখন নিজের ভাষাভাষী মানুষের জন্য ভেতরে ভেতরে মরুভূমির মতো তৃষিত হয়ে থাকে মানুষ। আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের ভাষা। বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি, পড়ালেখা করি, গান গাই, ছবি আঁকি, সাহিত্য রচনা করি, হাসি-খেলি, আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করি। অন্য ভাষায় তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এই ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনের শুরুতে অন্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করে পরে আক্ষেপ করেছেন এবং মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন। মায়ের মুখের বুলি থেকে শিশু তার নিজের ভাষা আয়ত্ত করা শুরু করে এবং এই ভাষাতেই তার স্বপ্নগুলো রূপ দেবার চেষ্টা করে, এই ভাষাতেই লেখাপড়া করে এবং জগৎ ও জীবনকে চিনতে শুরু করে। ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে আন্তসম্পর্কের জন্য, দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত রাখার জন্য আমাদের অন্য ভাষা বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা শিখতে হয়। কিন্তু মাতৃভাষার বুনিয়াদ শক্ত না হলে অন্য ভাষা শেখাও আমাদের জন্য কঠিন হয়ে ওঠে।

সিদ্ধান্ত : স্বদেশের ভাষাকে ভালোবাসতে হবে, এর বিকাশ ও সমৃদ্ধিকে অবাধ করতে হবে এবং বিকৃতিকে রোধ করতে হবে। সুপেয় জল যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি স্বদেশের ভাষা সুমিষ্ট।

চার.

লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড

মূলভাব : লাইব্রেরি হচ্ছে জ্ঞানের আধার। একটি জাতির রুচির পরিশুদ্ধ জ্ঞানের গভীরতা ও সভ্যতার অগ্রগমন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় ঐ জাতির লাইব্রেরির মাধ্যমে।

সম্প্রসারিত ভাব : একটি জাতি বা দেশের সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, খেলাধুলা-বিনোদন, সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয়কে ধারণ করে সেই জাতির সযত্নে তৈরি লাইব্রেরি। কখনো কখনো মানুষের মুখ যেমন ব্যক্তির অন্তর্গত রূপ বা পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে, তেমনি লাইব্রেরি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতিকে চিহ্নিত করে। লাইব্রেরি জাতির অতীত ও বর্তমানকে এক সুতায় বেঁধে রাখে এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা দেয়। জ্ঞানান্বেষী ও সত্যসন্ধানী মানুষ লাইব্রেরিতে এসে নিজেকে সমৃদ্ধ করে এবং জাতির সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে ভূমিকা রাখে। একটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত সাহিত্যগ্রন্থ দেখে সংশ্লিষ্ট জাতির সাহিত্যরুচি উপলব্ধি করা যায়, বিজ্ঞানগ্রন্থ দেখে জাতির বিজ্ঞান-চিন্তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুভব করা যায়। তাই গ্রন্থাগার হচ্ছে কালের সাক্ষী। জ্ঞান-বিজ্ঞানসংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে লাইব্রেরি পরম বন্ধু এবং অনন্ত উৎস। পৃথিবীতে যত বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলোর প্রতিটির পেছনে রয়েছে লাইব্রেরির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই অনেক বড় বড় যুদ্ধের পরে দেখা গেছে বিজয়ী শক্তি পরাজিত জাতির লাইব্রেরিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। একটি বৃহৎ লাইব্রেরি জাতির সব ধরনের তথ্যই শুধু সংরক্ষণ করে না, দেশের সঠিক উন্নতিতেও প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। লাইব্রেরি মানুষের আনন্দেরও খোরাক জোগায় এবং মানুষের মনকে প্রশান্ত করে। পুস্তকপাঠ মানুষের একটি সৃষ্টিশীল শখ। আর এই শখ পূরণের জন্য লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী।

সিদ্ধান্ত : যে জাতি যত উন্নত, সেই দেশের লাইব্রেরি তত সমৃদ্ধ।

পাঁচ.

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না

মূলভাব : অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই মানুষ্যজীবনের সার্থকতা।

সম্প্রসারিত ভাব : ফুল এই জগতের একটি অনিন্দ্যসুন্দর সৃষ্টি। তার সৌন্দর্য দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়। ফুলের গন্ধে মানুষের মন ভরে ওঠে। ফুল থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে, ফুল থেকে তৈরি হয় ফল। সেই ফল মানুষ, পশু-পাখি খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করে এবং দেহ ও মনের বিকাশের জন্য খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে। ফুল-ফল থেকে তৈরি হয় জীবন রক্ষাকারী অনেক ওষুধ। ফুলের প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের সৌরভ। ফুল প্রিয়জনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপহার। যেকোনো আনন্দ-উৎসবকে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয় করতে ফুলের কোনো বিকল্প নেই। অন্যের মধ্যে আনন্দ-সঞ্চার ও উপকারের মধ্যেই ফুলের পরিতুষ্টি। রূপ-ঘ্রাণ-লাবণ্য সবই অপরের জন্য বিলিয়ে দিয়ে ফুল ধন্য হয়। মানবসমাজেও এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা

অন্যের কল্যাণে নিজের সমস্ত অর্জন উৎসর্গ করেন। বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কার মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে। সমাজসেবা করে নিজের জীবন তুচ্ছ করে সমাজকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়। পরার্থপরতা একটি মহৎ গুণ। পরের উপকারে নিজেকে বিসর্জন দিলে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দ অনুভব করা যায় এবং নিজের দুঃখ-বেদনাও ভুলে থাকা যায়। স্বার্থচিন্তা মানুষকে সুখ দিতে পারে না। আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষকে বিব্রত করে তোলে।

সিদ্ধান্ত : পুষ্পকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করে মানবকল্যাণের ব্রত গ্রহণ করলে অনির্বচনীয় তৃপ্তি অনুভব করা সম্ভব।

ছয়.

ইটের পর ইট মধ্যে মানুষ কীট

মূলভাব : নগরসভ্যতার পীড়নে মানুষের জীবন আজ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। শহরের কৃত্রিমতায় মানুষ ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হারিয়ে আজ কীটে পরিণত হয়েছে।

সম্প্রসারিত ভাব : নদী-নালা-খাল-বিল-পাহাড়-অরণ্য প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত দান। কিন্তু মানুষ সব সময়ই আধিপত্যবাদী। সে প্রকৃতির ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইটের পরে ইট গেঁথে একটার পর একটা দালান তৈরি করে নগর সৃষ্টি করেছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে প্রকৃতির প্রত্যাশিত বিকাশ। হারিয়ে যাচ্ছে ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়, সুমিষ্ট বায়ুপ্রবাহ, নদীর কলধ্বনি। সেই মমতাময় ও স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিকে দখল করে নিয়েছে এখন বড় বড় অট্টালিকা, বায়ু ও শব্দদূষণ, তীব্র যানজট ও কোলাহল। মানুষ এখানে স্বাভাবিকভাবে শ্বাসগ্রহণ করতে পারে না। শহরে গ্রামের সেই মিলনোন্মুখ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ নেই, তার বিপরীতে আছে পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এখানে কেউ কারো সুখ-দুঃখের অংশীদার হয় না। প্রত্যেকেই এখানে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বসবাস করে। ফলে আরণ্যক ভূমিকে ধ্বংস করে মানুষ যতই যন্ত্রসভ্যতার বড়াই করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ নগরসভ্যতার যাঁতাকলে পড়ে ভেতরে-বাইরে নিঃস্ব হয়ে কীটে পরিণত হচ্ছে। জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিখরে উঠেও মানুষ আজ ক্লান্ত, অবসন্ন। প্রকৃতি ধ্বংস করার কারণে মানুষ এখন প্রতিমুহূর্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ে শঙ্কিত থাকে। সে আজ মুক্ত পরিবেশের জন্য ব্যতিব্যস্ত। সে একটু নির্মল বাতাস সেবন করতে চায়, বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে চায়, প্রাণখুলে কথা বলতে চায়, সহমর্মী হতে চায় একে অন্যের। তাই আবার সে ফিরে পেতে চায় সেই প্রসন্ন, সুন্দর, স্নিগ্ধ গ্রাম।

সিদ্ধান্ত : নগর মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে কিছুটা সহজ করলেও তার স্বাচ্ছন্দ্যকে নষ্ট করে দিয়েছে। নগর মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

সাত.

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

মূলভাব : প্রকৃতির সবকিছুরই একটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে এবং সেই সৌন্দর্য যথোপযুক্ত পরিবেশেই স্বতঃস্ফূর্ত ও আকর্ষণীয়।

সম্প্রসারিত ভাব : সৌন্দর্য প্রকৃতির এক মহামূল্যবান দান। কোথায় সেই সৌন্দর্য সবচেয়ে নান্দনিক তা প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দেয়। নির্দিষ্ট পরিবেশের ব্যত্যয় ঘটলে সৌন্দর্যের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বন্য প্রাণীরা বনেই সুন্দর, পাখি মুক্ত আকাশে। ফুল সুন্দর গাছে, মাছ স্বাভাবিক জলে। কিন্তু বন্য প্রাণীকে লোকালয়ে, পাখিকে খাঁচায়, ফুলকে ফুলদানিতে, মাছকে ডাঙায় রাখলে তাদের জীবনের গতি ব্যাহত হয়, সৌন্দর্যের হানি ঘটে, কখনো কখনো জীবননাশের আশঙ্কা তৈরি হয়। এরা প্রত্যাশিত পরিমণ্ডল হারিয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠে। শিশুরও যথার্থ স্থান মায়ের কোল। মায়ের কোলে শিশুকে যতটুকু মানায়, অন্য কোথাও তা সম্ভব নয়। নিজেদের শখ-আহ্লাদ পূরণের জন্য মানুষ কখনো কখনো কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে বন্য প্রাণী, পাখি, মাছ পোষার চেষ্টা করে, কিছুটা হয়তো সফলও হয়। কিন্তু সেই সব প্রাণীর জীবনের ছন্দ নষ্ট হয়, ব্যাহত হয় যথার্থ বিকাশ। তাই কৃত্রিমতা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু প্রাণীর আবাস নয়, মানুষের জীবনেও কৃত্রিমতা কাম্য নয়। কখনো কখনো মানুষ মুখোশ পরে তার যথার্থ রূপকে ঢেকে কৃত্রিম আচরণ করে। ময়ূরের পেখম লাগালেই কাক কখনো ময়ূর হয় না।

সিদ্ধান্ত : যার যেখানে স্থান, তাকে সেখানেই থাকতে দেওয়া উচিত। প্রকৃত রূপেই সবকিছু সুন্দর, কৃত্রিমতা স্বতঃস্ফূর্ততার অন্তরায়।

আট.

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

মূলভাব : মানুষে মানুষে অনেক ধরনের বিভেদ-বৈষম্য থাকতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে আমরা সবাই মানুষ।

সম্প্রসারিত ভাব : সব মানুষ একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর একই জল-হাওয়ায় আমরা বেড়ে উঠি। আমাদের সবার রক্তের রং লাল। তাই মানুষ একে অন্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ভৌগোলিকভাবে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, অথবা আমরা যে যুগেরই মানুষ হই না কেন, আমাদের একটি পরিচয় আমরা মানুষ। কখনো কখনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা জাত-কুল-ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য তৈরি করে মানুষকে দূরে ঠেলে দিই, এক দল আরেক দলকে ঘৃণা করি, পশ্চাতে ফেলতে চাই, পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হই। কিন্তু এগুলো আসলে সাময়িক। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আমরা একে অন্যের পরম সুহৃদ। আমাদের উচিত সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা। প্রত্যেককে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া এবং তার অধিকার সংরক্ষণে একনিষ্ঠ থাকা। মানুষের মধ্যে নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, আশরাফ-আতরাফ, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, কেন্দ্রবাসী-প্রান্তবাসী এমন ভাগাভাগি কখনোই কাম্য হতে পারে না। তাতে মানবতার অবমাননা করা হয়। তাই আধুনিক কালে এক বিশ্ব, এক জাতি চেতনার বিকাশ ঘটছে দ্রুত। মানব জাতির একই একাত্ম-ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে যুগে যুগে, দেশে দেশে মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ কমে আসবে। মানুষ সংঘাত-বিদ্বেষমুক্ত শান্তিপূর্ণ এক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সর্বত্র মনুষ্যত্বের জয়গাথা ঘোষিত হবে।

সিদ্ধান্ত : সব ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, বিশুদ্ধভাবে ভালোবাসতে পারলেই বিশ্বে প্রার্থিত সুখ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে।

আবেদনপত্র ও চিঠি

এক. জরিমানা মওকুফের জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদন।

তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২২

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
কার্তিকপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।
মাধ্যম : শ্রেণিশিক্ষক।

বিষয় : জরিমানা মওকুফের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। আমি সাধারণত প্রতি মাসের নির্ধারিত তারিখেই আমার বেতন পরিশোধ করে থাকি। কিন্তু এ মাসে বাবা টাকা পাঠাতে দেরি করায় নির্দিষ্ট দিনে বেতন পরিশোধ করতে পারিনি, যে কারণে আমার জরিমানা হয়েছে। আমি আজ বেতন পরিশোধ করতে চাই। কিন্তু আমার পক্ষে জরিমানা দেওয়া কষ্টকর।

অতএব, বিনীত আবেদন এই যে, সহৃদয় বিবেচনার মাধ্যমে জরিমানা মওকুফ করে আমার বেতন পরিশোধ করার অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র

ফয়সাল আহমেদ সুমন

শ্রেণি : সপ্তম

রোল নম্বর : ৯

দুই. স্কুলে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন।

তারিখ : ৩রা আগস্ট ২০২২

বরাবর

প্রধান শিক্ষক

জামালপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

জামালপুর।

বিষয় : সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের স্কুলের টিউবওয়েলটি আর্সেনিকমুক্ত না হওয়ায় আমরা খাওয়ার পানির বিশেষ সংকটে আছি। এ অবস্থায় আমাদের স্কুলে দ্রুত একটি আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করা দরকার।

অতএব, জনাবের নিকট বিনীত আবেদন, জরুরি ভিত্তিতে একটি আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক

জামালপুর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে

অনিন্দ্য সোম

শ্রেণি : ৭ম

রোল : ০৫

তিন. তোমার এলাকায় পাঠাগার স্থাপনের জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট একটি আবেদন পত্র লিখো।

তারিখ : ২রা জুন ২০২২

বরাবর

উপজেলা চেয়ারম্যান

গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদ

রাজশাহী।

বিষয় : গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ায় একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ায় হাইস্কুল ও প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ জনসংখ্যা প্রায় দুই হাজারের ওপরে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, এখানে কোনো পাঠাগার নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানচর্চা, মানসগঠন ও সৃজনশীল চেতনা বিকাশে একটি পাঠাগার খুবই প্রয়োজন। এ ছাড়া এলাকায় দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই। এখানে একটি পাঠাগার হলে তরুণরাও তাদের অলস সময়কে জ্ঞানচর্চার মতো প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করতে পারবে।

অতএব, গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ায় সব বয়সের জনসাধারণের উপকারের কথা বিবেচনা করে অতিসত্বর এখানে একটি পাঠাগার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক

গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ার জনসাধারণের পক্ষে

রোদেলা শারমিন

চার. তোমার ছাত্রাবাস জীবনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তোমার মাকে পত্র লেখ।

শাহজাদপুর

সিরাজগঞ্জ

১৪ই জুন ২০২২

পূজনীয় মা

আমার প্রণাম নিও। বাবাকে আমার প্রণাম দিও। তুমি ও বাবা কেমন আছ? তোমাদের জন্য আমার সব সময়ই চিন্তা হয়। নিজেদের শরীরের প্রতি যত্ন নিও। আমি এক সপ্তাহ আগে আমার স্কুলের ছাত্রীনিবাসে উঠেছি। ছাত্রীনিবাসের পরিবেশ খুবই ভালো। বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রীরা এখানে থাকে। ছাত্রীরা পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। যে কারণে কারো কোনো সমস্যা হয় না। অবসর সময়ে অনেকে একসাথে গল্প করি। আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যায় যেমন সবাই একত্রে আড্ডা দিই, অনেকটা সেই রকম। ছাত্রীনিবাসের মধ্যেই একটি ছোট পাঠাগার আছে। এখানে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের বই আছে। ওখানে বসে বই পড়া যায় আবার তিন দিনের জন্য কক্ষেও নিয়ে আসা যায়। আমার কক্ষে যে মেয়েটি আছে,সেও ৭ম শ্রেণির ছাত্রী। ওর নাম মণি। ও খুলনার মেয়ে। মণি খুবই সুন্দর রবীন্দ্রসংগীত গায়। তোমাদের জন্য মন খারাপ হলে মণি আমাকে গান শোনায়। আমার কক্ষটা চারতলায়। কক্ষের জানালায় দাঁড়ালে সবুজ গাছের উপর দিয়ে সুন্দর আকাশ দেখা যায়। ছাত্রীনিবাসে একটি মিলনায়তন আছে, সেখানে ক্যারম ও টেবিল টেনিস খেলা যায়, শীতের সময় ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম প্রথম ছাত্রীনিবাসের খাবার খুব ভালো লাগত না, তখন তোমার রান্নার কথা খুব মনে হতো। কিন্তু এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। প্রতি মাসে দু বার বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, তখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে অনেকটা উৎসবের মতো। আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না। আশা করি আমি ভালোই থাকব।

স্বচ্ছ কেমন আছে? ওর লেখাপড়ার প্রতি নজর রেখো। পূজার ছুটি হলেই আমি বাড়ি চলে আসব। আমার জন্য আশীর্বাদ করো।

ইতি

তোমাদের আদরের

শুভ্রা গোস্বামী

	ডাকটিকিট
প্রেরক	**প্রাপক**
শুভ্রা গোস্বামী	**রেখা গোস্বামী**
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	**কলেজ রোড, সিরাজগঞ্জ**

পাঁচ.তোমার জীবনের লক্ষ্য কী জানিয়ে বড় ভাইকে চিঠি লেখ।

দোহার, ঢাকা

১৩ ই জানুয়ারি ২০২২

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই,

আমার সালাম নেবেন। বাড়ির সকলে আমরা ভালো আছি। আমার স্কুলের ক্লাস ভালোভাবে শুরু হয়েছে। আমিও পড়াশোনা শুরু করেছি। আদরের ছোট বোন অত্রিকে ভর্তি করানো হয়েছে। আপনার কথামতো আমরা দু'জনে একসঙ্গে স্কুলে যাই। আপনি চিন্তা করবেন না।

আপনি জানতে চেয়েছিলেন আমি বড় হয়ে কী হতে চাই। আমাদের জলীল স্যারকে তো আপনি চেনেন। আমি স্যারকে খুব পছন্দ করি। স্যার আমাদের খুব ভালোভাবে পড়ান। পড়ানোর সময় আমরা কীভাবে বড় হতে পারব, দেশের মানুষের সেবা করতে পারব, পৃথিবীকে আরো সুন্দর করতে পারব—এসব বলেন। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের জন্য এখনো আদর্শ শিক্ষক অনেক বেশি দরকার। তাই আমি ঠিক করেছি, ভালোভাবে পড়ালেখা শেষ করে আমি শিক্ষক হব।

আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। আমাদের এলাকার সবাই ভালো আছেন। দাদা-দাদি এখন বেশ সুস্থ। আপনি বাড়ি আসার সময় আমার জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্রিকা নিয়ে আসবেন। ভালো থাকবেন।

ইতি

আপনার আদরের

সুমন রহমান অর্ক

প্রেরক:	প্রাপক ডাকটিকিট
সুমন রহমান অর্ক	মোয়াজ্জেম হোসেন নীলু
মিঞাবাড়ি, চরকাবা	১৯/৫০ রূপনগর
দোহার, ঢাকা ১৩৩১	পল্লবী, ঢাকা ১২১৬

ছয়. তোমার এলাকার একটি লোকজ উৎসবের বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে পত্র লিখ।

প্রিয়াঙ্কা বড়ুয়া

রাজানগর, চট্টগ্রাম

তারিখ : ৮ই মে ২০২২

প্রিয় পুতুল,

আমার প্রীতি ও ভালোবাসা নাও। আজ প্রায় দুই বছর হতে চলল তুমি রাশিয়া চলে গেছ। আমাদের দুজনের জীবন যে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ছিল, তা কিছুতেই ভুলতে পারি না। তুমি তোমার বাবা-মার সঙ্গে রাশিয়া চলে যাওয়ার পর এখনো আমাদের এলাকার নানা অনুষ্ঠান সেই আগের মতোই আমরা উপভোগ করি। তবে আমরা তোমার অভাব বোধ করি। এবার আমাদের এলাকায় বেশ বড় আয়োজনে বৈশাখী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ আমি সেই উৎসবের কথা বলতেই তোমাকে চিঠি লিখছি।

তুমি তো জান, আমাদের সারা বাংলাদেশেই পহেলা বৈশাখ নববর্ষ হিসেবে পালিত হয়। এখন আমাদের রাঙ্গুনিয়াতেও পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে ব্যাপক আয়োজনে নানা অনুষ্ঠান হয়। রাজানগরে এবারই প্রথম বৈশাখী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। স্বপন, পুলক, হ্যাপী, চৈতালী, অনিক, দীপা, কুমকুম, নাহার, রাজু, সজল এবং আমি সবাই মিলে সকাল সকাল আমাদের বিদ্যাময়ী স্কুলের মাঠে চলে যাই। প্রথমে ওখান থেকে সকাল সাতটায় শুরু হয় বৈশাখী শোভাযাত্রা। নানা রঙের ব্যানার-ফেস্টুন হাতে আমরা র‍্যালিতে অংশ নিই। র‍্যালি শেষ করে স্কুলের মাঠে চলে আসি। ওখানেই বিশাল আকারে মেলা বসেছে। মাঠের উত্তর দিকে চড়কগাছের আয়োজন, তার পাশে বসেছে চুড়ির দোকান। ছোট ছোট বাক্সে নানা ধরনের চুড়ির পসরা সাজিয়ে বসেছে মহিলারা। তার পাশে চানাচুর ও নিমকি ভাজা ও বিক্রি চলছে। আমি গরম নিমকিভাজা আধা কেজি কিনে সবাই মিলে খেয়েছি আর ঘুরে ঘুরে মেলাটা দেখেছি। মাঠের পূর্ব কোণে বাঁশ-বেতের নানা গৃহস্থালি দ্রব্য নিয়ে বসেছে বিক্রেতারা। ওখানেও বেশ ভিড়। তার পাশেই নানা ধরনের বেলুন, বাঁশির পসরা বসেছে। আমি আমার ছোট বোন প্রিয়ন্তির জন্য বেলুন ও বাঁশি কিনেছি। ওর জন্য রঙিন ফিতাও কিনেছি। দীপা তো যেটা দেখে সেটাই কেনে এমন অবস্থা ওর। হাতে যে কয়টা টাকা ছিল, সব টাকায় দীপা ওর ভাই-বোনের জন্য নানা জিনিসপত্র কিনেছিল। রাজু, সজল, হ্যাপী, অনিক, স্বপন বাঁশের তৈরি কলমদানি কিনেছিল। আমরা সবাই মিলে চড়কগাছেও উঠলাম। ওখানে উঠে তো চৈতালী ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু কি আর করা, দশপাক না খেয়ে তো আর নামা যাবে না। চৈতালী বলেছে, ও আর কখনো চড়কগাছে উঠবে না।

আজ আর লিখছি না। তুমি ভালো থেকো। জ্যাঠা-জেঠিমাকে শ্রদ্ধা দিও। তোমার সব খবর জানিয়ে আমাকে লিখো। তোমার জন্য অসীম ভালোবাসা রইল।

ইতি

প্রিয়াঙ্কা বড়ুয়া

AIR MAIL	STAMP
FROM PRIANKA BORUA RAJA NAGAR CHITTAGONG BANGLADESH	TO FAHMIDA PUTUL MOSCOW RUSSIA

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম–বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

বিনয়ীকে সবাই পছন্দ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।